প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর ১৯৬০

প্রকাশক : সুধাংশুশেখর দে । দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট । কলকাতা ৭০০ ০৭৩

মুদ্রক : অরিজিৎ কুমার । টেকনোপ্রিন্ট
৭ সৃষ্টিধর দত্ত লেন । কলকাতা ৭০০ ০০৬

বিষয়সূচি

ছি ট ম হ ল

বই আর বইওয়ালা

Hawkers of Books—they were all Mohammadans and went by the name of Chāchās. They carried on their backs a heavy load of books, old 2nd hand and new and went from door to door. Rev. Lal Behari Day : *Recollections of My School Days*, pp 60-62.

দিল্লি-প্রবাসী আমার কোনো বন্ধু একবার চিঠিতে লিখেছিলেন যে কলেজ স্ট্রিটকে এখন বই পাড়া বলা হয়, কিন্তু কেন ? বোধ হয় এতে কলেজ স্ট্রিটের গৌরব সামান্যই বাড়ে, আর আমাদের গৌরব একেবারে ছাড়ে, কারণ আমরা তো বরাবর সারা কলকাতাকেই একসময় বইয়ের শহর বলে ভেবেছি। তা সত্যি—রাস্তার উপর সারা দুনিয়ার নামী-দামী আর অভাবনীয় বইয়ের এমন নিয়মিত বাজার আর কোন দেশে আছে ?

শুনেছি প্যারিস শহরে স্যেন নদীর ধারে পুরনো বই, পুরনো ছবি বিক্রি হয়। কিন্তু সে তো আর চোখে দেখিনি ! তবে যদিও পৃথিবীর খবর আমার কিছুই জানা নেই, তবু ভারতবর্ষের আর কোথাও যে দীর্ঘদিন ধরে চালু পুরনো বইয়ের এমন বাজার আর নেই—একথা নির্ভয়ে বলা চলে।

আমি ছাত্রজীবনে হাতিবাগান থেকে ভবানীপুর পর্যন্ত পুরনো বইয়ের যে বাজার দেখেছি সেগুলোর কিছু অন্তত তখনই চল্লিশ-পঞ্চাশ বছরের পুরনো। কলকাতা যত বাড়ছে তত দোকানও বেড়ে বেড়ে বালিগঞ্জ স্টেশন পর্যন্ত পৌঁছেছে। হাল আমলের দোকানের কথা পরে বলব, আগে চোখে যা দেখেছি, যেখানে দাঁড়িয়ে বই কিনেছি, যাঁদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল, যাঁরা আমার হিতৈষী আর প্রায় শিক্ষক স্থানীয় ছিলেন তাঁদের কথা বলি। স্মৃতি-নির্ভর এই বর্ণনার সুবিধার জন্য আমি উত্তর কলকাতা থেকে দক্ষিণে যাচ্ছি।

শুনেছি এখন শ্যামবাজারে ভূপেন বোস অ্যাভিনিউতেও পুরনো বই পাওয়া যায়। চল্লিশ বছর আগে পুরনো বইয়ের বাজার বলতে শুরুতেই ছিল

হাতিবাগান। ওখানে বাজারের প্রথম গেটে বারোমাস বই বেচতেন নারাণ আর গণেশ দুই ভাই, নারাণ লম্বা আর গণেশ বেঁটে। এঁদের খবর দেন প্রফুল্ল মিত্তির মশাই। তিনি ছিলেন রবিবারে অমৃতবাজারের প্রায় নিয়মিত লেখক, আর পুরনো বইয়ের জহুরি। পরে বোধ হয় গ্যালিফ স্ট্রিটে সুশীল গুপ্তের বইয়ের ব্যবসায়ে যোগ দেন। বলেছিলেন—বই চিনতে হলে তার মলাট, টাইটেল পেজ, বিজ্ঞাপন সব কিছুই আলাদা আলাদাভাবে দেখে মাথায় রাখতে হয়। প্রফুল্ল-বাবু আরো বলেছিলেন—সম্পাদক রামানন্দের কাছে দু'-সেট 'প্রবাসী' থাকত। একটিতে মলাট আর বিজ্ঞাপন নিয়ে সম্পূর্ণ পত্রিকা, অন্যটিতে বিজ্ঞাপন বাদ দিয়ে শুধু লেখকদের লেখা।

হাতিবাগান বিশেষভাবেই ছিল বাংলা বইয়ের বাজার। বিয়ের পদ্য, থিয়েটারের হ্যাণ্ডবিল, কিছু বটতলা, গরাণহাটা, আহিরিটোলার চোথা বই পর্যন্ত এঁদের কাছে পাওয়া যেত। এতই মুখ্যু ছিলুম যে তার কোনো দামই তখন দিইনি। একবার অর্দ্ধেন্দুশেখর নাট্য পাঠাগারের ছাপমারা প্রায় সত্তর-আশিখানা অত্যন্ত পুরনো কাব্য আর নাটক এঁদের কাছে এল। তাদের নাম-ধাম আমার অজানা। আমি তো যাকে বলে বাঁশবনে ডোম কানা! শেষ কালে তা থেকে নারাণবাবুই পনের-ষোলখানি বেছে দিয়ে বলেছিলেন, সবগুলো বই যদি নেন তাহলে নাটকের বেলায় একটাকা আর পদ্যের বই আটখানা হিসেবে পড়বে—নেবেন? আমি নিতে পারিনি। বিনোদিনী দাসীর কবিতার বইও এঁরা দিয়েছিলেন, কিন্তু লেখনী পুস্তিকা ভার্যা পরহস্তগতা হলে আর তো ফেরত আসে না! তাই এখন আর কাছে নেই।

বিস্তর কবিরাজি বই এঁরা দিতেন। চরক, সুশ্রুত, বাগভট্ট ছাড়া কল্পতরু হাউস, জবাকুসুম হাউস—এদের বইও হাতিবাগানে পাওয়া যেত। অনেকের হয়ত মনে নেই যে জবাকুসুম হাউস বিজয় রক্ষিতের টীকা মূল আর অনুবাদ দিয়ে মাধবনিদানের অতি উৎকৃষ্ট সংস্করণ বের করেছিলেন। সায়নভাষ্যের সঙ্গে চার খণ্ড বিশাল আকারের অথর্ববেদ, যার সর্বাঙ্গে ছাপ দেওয়া ছিল—'বাহিরে যাইবে না'। কোনো এক আয়ুর্বেদ ভবনের বই, তাও এঁদের কাছে পেয়েছি।

এই দোকানে সজনীকান্ত দাস মশাই খুব আসতেন। একজন তো সজনীবাবুকে 'ধর্মবাপ' বলতেন। 'শনিবারের চিঠি'-র পুরনো সংখ্যা—মণিমুক্তো গাঁথা আর মণিমুক্তো ছেঁড়া দুই-ই এখানে পাওয়া যেত। একটু টীকা করি। 'মণিমুক্তো' হল সাহিত্য আর সাহিত্যিকদের নিয়ে তরল কেচ্ছা। বাড়িতে

'শনিবারের চিঠি' এলে গুরুজনেরা লুকিয়ে রাখতেন। মণিমুক্তো যাতে সহজে ছিঁড়ে নিয়ে বন্ধুদের পড়ানো যায় তাই পত্রিকায় 'সংবাদ সাহিত্যে'র সঙ্গে 'পারফোরেশন' করা থাকত। কুচোকাচা কবিতার বই যেসব থাকত সেগুলো তখনই দুষ্প্রাপ্য। এখন সুকুমার সেন মশায়ের সাহিত্যের ইতিহাসেই কেবল তাদের নাম শোনা যাবে। আর কিছু শরৎ-সরোজিনী, সুরেন্দ্র-বিনোদিনী, অপূর্বসতী-মার্কা বিলুপ্ত নাটক আর প্রহসন।

আরো ছিল হরেক রকম রান্নার বই। বিপ্রদাস মুখুজ্জের পাকপ্রণালীর একটি পদ্য সংস্করণ পর্যন্ত ছিল। বিপ্রদাস মুখুজ্জের ছেলেই যে থিয়েটারের অপরেশ মুখুজ্জে তা জানা ছিল না বলে এঁরা আমাকে রীতিমতো লজ্জা দিয়েছিলেন।

দু'চারখানা 'ভোটরঙ্গ', 'লবডঙ্কা', 'ডাণ্ডাগুলি', 'ক্যা মজাদার', 'রবিবারের লাঠি' এবং 'অবতার' কাগজও দেখেছি। অশ্লীল ভেবে বাদ দিতুম। এখন থাকলে কাজে দিত। নারাণবাবু যখন ক্যানসারে মারা যান, গণেশবাবু তখন সেই খবর দিয়ে বললেন, 'আমাদের জাত গেল—আপনি আর আসবেন না। দেখবেন পরের মাস থেকে গেঞ্জি নিয়ে বসেছি। দাদা নেই—সামলাতে পারব না।'

নারাণবাবু আর গণেশবাবুর কাছে ক্যানিং লাইব্রেরি, চীনেবাজার বার-সিমলে পাড়ার অ্যালবার্ট প্রেসের বইও আমি কিনেছি। প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত মশাই বলেছিলেন গুরুদাস চাটুজ্জের বই তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজের বারান্দায় কোনো বেঞ্চির উপর থেকে প্রায়ই কিনতেন। এইরকম অনেক বাড়ির বেঞ্চিতে মজুমদার কোম্পানি, গরাণহাটা, সংস্কৃত প্রেস ডিপোজিটরির বই থাকত বলে জানা আছে।

চীনেবাজারে পদ্মচন্দ্র নাথের দোকানে পাওয়া যেত রবীন্দ্রনাথের প্রথম গানের বই 'রবিচ্ছায়া', আর বীরভূমের নবীনচন্দ্রের 'ভুবনমোহিনী প্রতিভা'। কে এই পদ্মচন্দ্র নাথ আর চীনেবাজারে কতদিন বা কোথায় এই দোকান ছিল তা আমি খোঁজ করেও পাইনি। হয়ত রাধারমণ মিত্তির মশাই এ কাজ পারতেন।

হাতিবাগান থেকে পিছু হটে আসি গোয়াবাগানে। সাহিত্য পরিষদ স্ট্রিট যেখানে কর্নওয়ালিস স্ট্রিটে এসে পড়েছে ঠিক সেখানে ছিল রাস্তার উপরে এঁদের দোকান। এঁরাও দুই ভাই। জাতে সুবর্ণবণিক, ছেলেদুটির নাম ভুলে গেছি। এঁদের ছোট্ট একফালি দোকানে বইয়ের ভাগ ছিল তিনটি। একটিকে বলত 'গৌরনিতাই'—অর্থাৎ বৈষ্ণব গ্রন্থ, অন্যটির নাম 'স্টার মিনার্ভা—থিয়েটারের গান, 'রেকর্ড কাকলি', 'বীণার ঝঙ্কার', কার অ্যাণ্ড মহলানবীশ ইত্যাদির পুরনো বাংলা গান, 'প্রীতিগীতি'—এই গোছের বই। মাঝখানে থাকত খিচুড়ি—অর্থাৎ

ইংরেজি বাংলা নাটক, নভেল, ইতিহাস ইত্যাদি হরেক রকম।

বঙ্গবাসী কলেজের ইংরেজি সাহিত্যের বিখ্যাত অধ্যাপক নীরেন রায়ের ভাগনি-জামাই সুশীল মিত্তির এই দোকানিদের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেন। সুশীলবাবু নিজেও সাহিত্যরসিক। তাছাড়া বইয়ের বিস্তর খবর রাখতেন। গুরুদাস চাটুজ্জের আট আনা সিরিজের গল্প-উপন্যাসের মধ্যে 'পাখীর কথা' বইখানির লেখক সুরেন্দ্রনাথই যে বিখ্যাত ঐতিহাসিক তা আমি তাঁর কাছেই প্রথম জানতে পারি। চাটুজ্জের এই আট আনা সিরিজ—'যাহা বিলাতকেও হার মানাইয়াছে'—তার প্রায় আদ্দেক বই এঁদের কাছে ছিল। নানারকম অভিধান, ব্যাকরণ আর পাঠ্য বই—মায় তার নোটবুক চাইলেও এঁরা চটপট যোগাড় ক'রে দিতেন। হরিনাথ দে মশাইয়ের 'গোল্ডেন ট্রেজারি'র নোট এঁরাই দেন। সর্বাধিকারী, গৌরীশঙ্কর দে, বিপিনবিহারী গুপ্ত আর যাদব চক্রবর্তীর পাটি-গণিতও পাওয়া যেত। শুধু গোখেলের পাটিগণিত কখনো পাইনি। বহরমপুরের সৈদাবাদের, বৃন্দাবনের রাধাকুঞ্জের বিখ্যাত বৈষ্ণব বইও এখানে পাওয়া যেত।

তারপর আসা যাক বীণা সিনেমার কাছে। পাশাপাশি দোকানে ছিল ব্রাহ্মসমাজের (সাধারণ আর নববিধানের) প্রায় সবরকম বই। এদের কবিরাজি আর জ্যোতিষের সংগ্রহও ভালো ছিল।

আরো পিছু হটে বাটার দোকানে আসা যাক। জহরলাল-পান্নালাল আর ইণ্ডিয়ান সিল্ক হাউসের উল্টোদিকে পর পর পাঁচ-ছ'টা পুরনো বইয়ের দোকান ছিল। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস সাজিয়ে নিয়ে একজন হাসি-খুসি বৃদ্ধ ছিলেন, তাঁকে বলা হতো 'বড়চাচা'। চিবুকে ছুঁচলো দাড়ি। চুল দাড়ি সব ফুরফুরে সাদা। বই চিনতেন আর চিনিয়েও দিতেন। মশলাদার পান খেতে খেতে খুব মিহি গলায় বলতেন কি ধরনের বই কার কাছে পাওয়া যায়, কার বইয়ের পাতা গুনে নিতে হয়, কার বই চোখ বুজে নেওয়া যায়, বইয়ের ফরমা কম আছে কিনা, কিভাবে দেখতে হয়—কত যে শিখেছি এঁদের কাছে বলে শেষ করতে পারব না। কিছু 'কুন্তলীন' পুরস্কার, কিছু ফসিউল্লার 'গোলাপ নির্যাস' বেগমবাহার সিরিজ, নানা ধরনের আত্মচরিতও ইনি দিয়েছেন। বলতেন, বই নিয়ে গিয়ে দু'চার বছর রোদে দেবেন। দেখবেন লাফে লাফে দাম বেড়ে যাবে।

এখন সব বাড়ির ছেলেরাই জানে যে কলেজ স্ট্রিটে পুরনো বই কেনাবেচা হয়। শৈশবে প্রথম এই খবরটা আমি 'মৌচাকে' পাই শৈলজানন্দের গল্পে। বাদলার দিনে বইওয়ালা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজছে, বইয়ের গায়ে কাদাজলের

ছিটে লাগছে—এমনি ধারা বর্ণনা। গল্পের ঘটনায় কোনো চমক ছিল না, তবু কেন জানিনে সেটা ভুলতে পারিনি। ছাত্রজীবনে আশুতোষ বিল্ডিং-এ যাতায়াতের সময় রোজই দেখতুম হেয়ার স্কুলের গেট থেকে প্রায় ওয়াই এম সি এ পর্যন্ত রেলিঙের বাঁধা দড়ি থেকে বই ঝুলছে, কিন্তু তেমন মন টানেনি। সাড়ে চারটে বেজে গেলে দাঁড়াবার আর সময় পেতুম না।

মাস দুই বাদে মার্চের প্রথমে একদিন তিনটে নাগাদ হঠাৎ বেরিয়ে দেখি—সে এক বিরাট সমারোহ, চমকে গেলুম। সযত্নে সাজানো-গোছানো যেন এক প্রদর্শনী। কোনো কলেজের অধ্যাপকের বোধ হয় সারাজীবনের সংগ্রহ আলমারি থেকে রাস্তায় এসেছে। বিউলফ আর চসার দিয়ে শুরু, ইংরেজি সাহিত্যের নামকরা ইতিহাস পাঁচ ছ'খানা, ক্যাসেলের আর অক্সফোর্ডের নানারকম অভিধান, খান কুড়ি পেঙ্গুইন আর এভরিম্যান, শেক্‌সপীয়রের বিচিত্র সব সংস্করণ, রোমান্টিক কবিদের প্রায় সকলেরই কাব্যসংগ্রহ, রেস্টোরেশন যুগেরও কিছু, অক্সফোর্ড বুক অফ ভার্সেস আঠারো, উনিশ আর বিশ শতকের। আর এত রকমারি নাটক যে নাম পড়লেই সন্দেহ হয়—সত্যি দেখছি কি না। ইস্কুল, কলেজ বা বাড়িতে খোলা শেলফে হাত দেবার হুকুম ছিল না। এই প্রথম স্বাধীনতা পেলুম—প্রত্যেকটা বই হাতে ক'রে নিয়ে উল্‌টে-পাল্‌টে দেখে দেখে দেড় ঘণ্টা পরে বাড়ি গেলুম। আর মনে মনে সংকল্প করলুম লাইব্রেরিতে বেশি না থেকে আধ ঘণ্টা সময় যেমন ক'রে হোক এখানেই দেব। নিজের কাছে দেওয়া সেই কবেকার অস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি ১৯৪৮ থেকে ১৯৭৮ পর্যন্ত টানা রাখবার প্রাণপণ চেষ্টা ক'রে গেছি। অন্য সব ঝোঁক আর আড্ডা ছেড়ে গেল, কখন যে ওখানেই ক্ষয়ে গেলুম আজ মনে পড়ে না।

যাক, যা বলতে যাচ্ছিলুম। পুবদিকের ফুটপাথে ছিল সেন-রায়, চক্রবর্তী-চ্যাটার্জি, দাশগুপ্ত, কমলা বুক ডিপো, ইউ এন ধর—এঁদের দোকান। পশ্চিমের ফুটপাতে প্রেসিডেন্সি কলেজ আর হেয়ার স্কুলের রেলিং জুড়ে কানু থেকে গেন্দু পর্যন্ত সে যুগের সেরা বইওয়ালারা। কানুর প্রত্যেক বইতে তার নিজের ফোটো আর রবার স্ট্যাম্প দেওয়া থাকত। সে ইতিহাস, ভ্রমণ, অভিধান, গেজেটিয়ার, ছবির বই—এ সবই বেশি রাখত। তপন দত্ত, আহমদ আলি, জব্বার, খলিল, জলিল, কুরবান, ওদুদ—এঁদের কাছে কিছু খুব দামি বই সর্বদা থাকত। সব ধরনের বইয়েরই অর্ডার নিতেন, কত যে বিদ্‌ঘুটে সে সব নাম। তপনের ভাই পঞ্চু কয়েক বছর পরে এলো, সে শুধুই বাংলা বই রাখত। অতটা ওস্তাদ নয়।

বাংলা বইয়ের সেরা আড়ৎ ছিল হেমবাবুর ; হেমচন্দ্র দে—বয়েস বেশি, সবাই খাতিরও করত। ইদানিং দাঁড়াতেন না, ছোট একটি কাঠের টুলে সর্বদা বসে থাকতেন, মানুষকে গ্রাহ্য করতেন না, বরং বইয়ে হাত দিতে বারণ করতেন। রামায়ণ মহাভারত ভাগবতের কতবার বাংলা অনুবাদ হয়েছে, অনুবাদকের নাম আর প্রকাশের সাল-তারিখ তাঁর মুখস্থ ছিল। আশ্চর্যের কথা এই যে, ব্রাহ্মসমাজের লেখক সম্বন্ধেও তাঁর বেশ জ্ঞান ছিল। হরদেব চট্টোপাধ্যায়ের গানের বই দিতে দিতে বেচারাম চট্টোপাধ্যায় সম্পর্কে বলেন—'ঐ যে লোকটা বেহালা ব্রাহ্মসমাজ গড়েছিল।' হেমবাবুই বলেন ভাগবতের সেরা সংস্করণ হল মহারাজা মণীন্দ্র নন্দীর, তারপর বহরমপুর, তারপর তাড়াস রাজবাড়ি, ত্রিপুরা আর নিম্বার্ক সম্প্রদায়। এ ছাড়া আরো দশ পনের রকম বিভিন্ন সংস্করণের খোঁজ হেমবাবু দেন। আমি দীর্ঘকাল ঘুরে ঘুরে সে সব যোগাড় করি। হেমবাবুকে কিছু প্রশ্ন করলে জবাব দেওয়ার সময় বলতেন, 'আপনার দেখছি—বাংলা সাহিত্যের পুরনো বই সম্বন্ধে তেমন কিছুই জানা নেই। লেগে থাকুন, লেগে থাকুন, আস্তে আস্তে চোখ খুলবে।' প্রথম সংস্করণের বই যে সংগ্রহের যোগ্য তাও যেন হেমবাবু শিখিয়েছিলেন। হেমবাবু অনেকদিন রোগ ভোগ ক'রে বড়ই কষ্ট পেয়ে মারা যান। বেলেঘাটায় ওঁকে বাড়িতে দেখতে গিয়ে দুঃখ পাই : মন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের আত্মীয় হলেও উনি কখনো বলেননি।

আমিরুল এমদাদ ওদুদ এঁরাও দামি বইয়ের ব্যাপারি ছিলেন। চামড়া বাঁধাই সোনার জলে নাম লেখা এনগ্রেভিং কিংবা লিথোগ্রাফে ভরা এঁদের সুন্দর সুন্দর বইগুলো শেল্‌ফ আলো ক'রে থাকত। এঁদের শখেই কলকাতার বড় বড় লোকের গোলা ভরেছে এ কথা খুব সত্যি।

গেঁদুর কাছে হাণ্টারের বাংলা বিহার উড়িষ্যার সব অ্যাকাউণ্ট, অ্যানাল, গেজেটিয়র—বুকানন হ্যামিলটন, আর্মি-নেভি, হোয়াইটওয়ে লেডল-র ক্যাটালগ, থ্যাকারের ডাইরেক্টরি, বাষ্টিড, কটন আরো সব সাহেবের ওল্ড ক্যালকাটা ইত্যাদি গোছের দুষ্প্রাপ্য বই, আইনের বই, এনসাইক্লোপিডিয়া, আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে—এসব খুব থাকত। দামি বই দেখবার জন্য তার আণ্টুনি বাগানের বাড়িতে যাই। কিসমিস আর বাদাম দেওয়া কী সুন্দর হালুয়া যে খাইয়েছিল!

ডঃ বারিদবরণ মুখুয্যের গল্প সবাই করতেন। তাঁর বাড়ি ছিল এক নম্বর কলেজ রো। রোজ একবার ক'রে বইয়ের স্টলগুলো ঘুরে গিয়ে বাছাই বই কিনে কিনে চমৎকার একটি লাইব্রেরি গড়ে তুলেছিলেন। বারিদবরণের সংগ্রহের

সামান্য অংশ ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে আছে। খুচরো কিছু গোলপার্কের রাস্তায় ছাপমারা বিক্রি হয়েছে, তাছাড়া রাধাপ্রসাদ গুপ্ত মশায়ের সংগ্রহে আছে। দু-চারখানা ঝড়তি-পড়তি আমরাও পেয়েছি।

ঐ পাড়ায় নিয়মিত ঘোরাঘুরির ফলে অনেক মহারথীর দেখা পেয়েছি। তাঁদের পাশে দাঁড়িয়ে বইও কিনেছি। বিনয়কুমার সরকার, নির্মলকুমার বোস, অশোকনাথ শাস্ত্রী, সুনীতিকুমার ও সুকুমার সেন প্রায়ই আসতেন। ইউনি-ভার্সিটির ক্লাস নেবার পর নির্মলবাবু আর সুনীতিবাবুর গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকত—যে যে বই ওঁরা পছন্দ করতেন দোকানিরা গাড়িতে তুলে দিতেন। একবার নলিনীকান্ত ভট্টশালীর ঢাকা মিউজিয়মের ক্যাটালগ আমি নিতে চাইলে নির্মলবাবুর অনুমতি নিয়ে তবে দোকানি আমাকে দিলেন। বিভিন্ন রেল কোম্পানির ছাপানো বাংলা ভ্রমণ কাহিনী, অ্যালবাম, এসব কেনবার কথা নির্মলকুমারই আমাকে বলেন, গৌরকেও বলেছেন আমাকে ভালো বই বেছে দিতে। সাহিত্য পরিষদের আর বরেন্দ্র রিসার্চের কিছু ভালো বই এঁদের উপদেশে যোগাড় করতে পারি।

থেকে থেকে হুজুগ উঠত কলেজ স্ট্রিটে বই বেচাকেনা কর্পোরেশন বন্ধ ক'রে দেবে। এইরকম আচমকা নোটিশ পেয়ে চিঠি লেখাবার জন্যে এঁরা আমাকে পথেই ধরে বসেন। দু'চার ছত্তর লিখে সুনীতিকুমার, সুকুমার সেন, নির্মল বসু আর মহাদেবপ্রসাদ সাহার ঠিকানা আমি ডায়েরি থেকে বের ক'রে দিই। ওঁরাও তখুনি ছুটে যান, আর সে-যাত্রা সহজে গণ্ডগোল মিটে যায়। কাজ হবার পর ওঁরা খুশি হয়ে বঙ্কিমচন্দ্র, মাইকেল আর রবীন্দ্রনাথের কিছু কিছু দুষ্প্রাপ্য সংস্করণ কেনা দামে আমাকে দিয়ে কৃতার্থ করেছিলেন।

ক্যালকাটা ওল্ড বুক স্টল যদিও ফুটপাথের ব্যাপার নয়, তবু শুধু পুরনো বই নিয়েই তার কারবার। তাই সে কথা একটু বলছি। সি. ও. বুক-কে সবাই বলতেন ইউসুফের দোকান। ইউসুফ আলি স্ত্রীর রুপোর গয়না বেচে দোকানটি খোলেন। তার ঠিক দেড় মাস বাদে হঠাৎ তাঁর চাকরি যায়। একটুও দমে না গিয়ে দু'টাকা দিয়ে একটি বড় খোলার ঘর ভাড়া নিয়ে আধখানায় বইয়ের গুদোম ক'রে বছরের পর বছর দিনরাত খেটে অদ্বিতীয় অকল্পনীয় একখানি দোকান গড়ে তোলেন। কী বই যে না পাওয়া যেত! ঘরের মেঝে থেকে ছাত পর্যন্ত থাকে থাকে সাজানো নানা ধরনের জার্নাল, বেশির ভাগই পুরো সেট। আমি সামান্য কিছু দেখেছি। যেমন, টাটার মার্গ, ক্যালকাটা রিভিউ, মডার্ন

রিভিউ, দিল্লির 'রূপলেখা', বম্বের 'টাইম্‌স অব ইণ্ডিয়া অ্যানুয়াল', 'ইণ্ডিয়ান হিস্টরিক্যাল কোয়ার্টারলি', 'ইণ্ডিয়ান কালচার', 'বেঙ্গল পাস্ট অ্যাণ্ড প্রেজেণ্ট', 'ললিতকলা অ্যাকাডেমি' (এনশেণ্ট), 'সিংঘী জৈন গ্রন্থমালা'—কত বা নাম করব। পালি টেক্‌স্ট সোসাইটির (লণ্ডন) থেকে সমস্ত ত্রিপিটকের মূল আর ইংরেজি অনুবাদ—সেগুলো আবার আলাদা ক'রে সুন্দর চামড়া বাঁধাই, সোনার জলে নাম লেখা। সংস্কৃত আর প্রাচীন বাংলা বইও অজস্র। এক শকুন্তলা নাটকের পনের-ষোলটি সংস্করণ এক জায়গায় বসে দেখা যেত। তেমনি শ্রীরামপুরে ছাপা মেঘদূত, তাছাড়া কৃত্তিবাস ও কাশীদাস। মহারাজা শৌরীন্দ্রমোহন ও যতীন্দ্র-মোহন ঠাকুর, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বেণীমাধব বড়ুয়া, নরেন্দ্রনাথ লাহা, বিমলাচরণ লাহা—এঁদের সমস্ত বই, নানা ভাষার অভিধান সর্বদা মজুত থাকত। সি. ও.-র বই পোকাধরা বা গলে পড়া অবস্থায় দোকানে দেখিনি—যা দেখেছি সব বাঁধাই আর ঝক্‌ঝকে। বালথাজার সলভিন্‌স আর ড্যানিয়েলের স্কেচ বিক্রি হবার আগে আমাকে কিছু কিছু দেখতে দিয়েছিলেন। দামের অঙ্ক শুনে স্তম্ভিত হতে দেখে বলেছিলেন—দাম বেশি নয়। বোম্বাই থেকে কোনো বাঙালি ভদ্রলোক ওগুলো কিনে নিলেন।

আমার যৎসামান্য সংগ্রহ দেখবার জন্য মালিক ইয়াকুব সাহেব দু'একবার আমার বাড়িতে পায়ের ধুলো দেন। শেষদিন শরীর ভালো ছিল না। আধ পেয়ালা পাতলা লিকার আস্তে আস্তে খেতে খেতে বললেন, 'যা লেখবার লিখে নিন, দেরি করবেন না বেশি।'

অনেক আগেই ওঁর দোকানের কথা লিখব বলে প্রস্তাব করি, উনি রাজিও হন। দোকানের কথাই তো ওঁরও বায়োগ্রাফি হবে, ওঁকে দেখিয়ে তবে ছাপানো হবে—এত সব কথা হল। কিন্তু লিখতে চাইলে কি হবে—লিখতে দেবে কে? কাজ সেরে সপ্তাহে তিন দিন ওঁর দোকানে যাব বলে বেরিয়েও বাসের ভিড়ে মাসে দু'দিন মাত্র যেতে পেরেছিলুম। হাঁপানি বাড়ার ভয়ে চলে যেতেন শিগ্‌গির ক'রে। আমার সঙ্গে দেখা আর হতো না। প্রচণ্ড বেড়ে গেল রোগটা, আমাকে ওঁর বাড়িতে যেতে বলেছিলেন। যাওয়াও হল না, লেখাও হল না। অনেকের অনেক গল্প শুনেছিলুম, কিছুই তো লিখিনি, এখন অনুশোচনাই সার।

সি. ও. বুক স্টলে প্রথমদিকে সর্বক্ষণ থাকতেন সত্যেন্দ্রনাথ কর। তিনি আমাকে দোকানের সামনে ঘোরাঘুরি করতে দেখে প্রথমে উঠে আসতে বলেন। দু'দিন যেতে বসতে টুল দেন—শেষে গল্প শুরু ক'রে দিতেন, শুধু বইয়ের গল্প।

বই যোগাড় করা, তার দাম কষা, ভালোরকম ক্যাটালগ তৈরি—এসবের একটু একটু আন্দাজ তাঁর কাছেই পাই। সত্যেনবাবু বলেছিলেন, 'আমার কাছে ভালো দূরবিন আছে, তাই দিয়ে আমি দেখতে পাই কলকাতার কোন কোন বাড়িতে গ্রিফিথের আর ইয়াজদানির অজন্তা, কোথায় পোপের পার্শিয়ান পেন্টিং, কোথায় ড্যানিয়্যালের স্কেচ বই আছে'—বলে হেসে উঠতেন। খুব মিথ্যে বলেননি। যেসব বাড়ির নাম করেছিলেন তার কয়েকটি বাড়িতে ঐ সব সত্যিই ছিল। তারপর বলেন ক্যামব্রে কোম্পানি আর সি. ও.-তেও স্যার আশুতোষ বই কিনেছিলেন বলে কথা চালু আছে।

এ পাড়ার দোকানিরা অনেকে বেঁচে নেই, বেঁচে থাকলেও বৃদ্ধেরা রাস্তায় বড় আর দাঁড়ান না। তাই সাত পাঁচ ভেবেই তাঁদের নাম-ধাম এলোমেলো হলেও ধরে দেবার চেষ্টা করলুম। এঁদের কাছে যে সাহায্য ও সৌহার্দ্য পেয়েছি তার আরো একটা দৃষ্টান্ত দিই। সেবার অধ্যাপক নির্মলকুমার বোসের স্মৃতিসভায় দেরিতে পৌঁছে দেখি ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হল পুরো ভর্তি—এক কোণে গেন্দু, আমিরুল, ইয়াকুব, কুরবান, ওদুদ—এঁরা দাঁড়িয়ে আছেন। আমাকে দেখেই গেন্দু বললেন, 'এই যে শুনুন, প্রফেসর নির্মল বোসকে আমরা সবাই ভালোবাসতুম, কিছু বলতে চাই, তা সভায় বলা তো আমাদের অভ্যেস নেই। আপনি আমাদের তরফ থেকে আমাদের কথাটা বলে দিন।'

জাস্টিস শঙ্করপ্রসাদ মিত্তির সভাপতি ছিলেন, তাঁর অনুমতি নিয়ে বইওয়ালা-দের শ্রদ্ধা নিবেদন আর তাঁদের নিজস্ব আবেদন দুইই জানাতে পেরে সেদিন ধন্য হয়েছিলুম, তাঁরাও খুশি হয়েছিলেন। সুনীতিকুমার স্মরণ সংখ্যায় ('পরিচয়' পত্রিকায়) এঁদের নিজস্ব কথা সযত্নে ছাপা হয়েছিল।

ও-পাড়ার দোকানিদের অনেকের কথাই বলা হল না, খানিকটে স্মৃতিবিভ্রম, খানিকটে ক্ষমতার অভাব দুই মিলে সংক্ষেপে শেষ করতে গিয়ে হঠাৎ মনে পড়ল নিসারুলের কথা। বেঁটেখাটো, মুখে বসন্তের দাগ, কদমছাঁট চুল, ময়লা হাফ-শার্ট পরা, হাসি হাসি মুখ। সে প্রথম থেকে শেষ দিন পর্যন্ত অকাতরে আমায় বন্ধুর মতো সেবা আর সাহায্য করে গেছে। ভালো বই পেলে আমাকে ছাড়া কাউকে দিত না, আমার ফর্দ নিয়ে আমি পৌঁছবার আগে থেকে স্টলগুলো দেখেশুনে কোন বই অন্যের কাছে আছে, কত নম্বরে আছে, সব হদিস ক'রে রাখত। যদিও শুনেছি যে আদবেই তার অক্ষর পরিচয় ছিল না! ইদানিং আমার বইয়ের বোঝা কাঁধে নিয়ে রাস্তা পার করিয়ে ভিড়ের বাসে তুলে দিত।

দুর্বল চোখ নিয়েও শেষ ক'বছর যে বই কিনতে পেরেছি তা শুধুই নিসারুলের জন্য। সমস্তিপুরে তার দেশের বাড়ি থেকে একবার সে একটি ভালো ল্যাংড়া আম এনে দিয়েছিল। বইয়ের দাম ছাড়া তাকে আমি কোনোদিন কিছু দিইনি।

ফ্রি স্কুল স্ট্রিটে দাদারা বই কিনতেন। একবার ময়মনসিংহের সুধীন্দ্রনারায়ণ সিংহের বাংলা আর সংস্কৃত বই যা আসে তা ওঁরা আমাকে দেন। ধর্মতলা, ওয়েলেসলি, ইলিয়ট রোড, ফ্রি স্কুল স্ট্রিট, ওয়েলিংটন স্ট্রিটে তখনো ইংরেজি বই আর গানের রেকর্ড বিক্রি হতো। তবু ভালো বইও ছিল। ছোকরা শাহাদুর খুব ভালো বই দিত। সামাদ আর কালাম দু-তিন জায়গাতেই বই যোগাড় ক'রে দিত। ভালো বই দিতেন শেখ মার্তাজা আলি। ইনি নির্মলচন্দ্র চন্দ্রের বাড়ি আর নাহার বাড়িতেও বই দিয়েছেন। 'এনকাউন্টার', 'কোয়েস্ট', 'ইনটার-ন্যাশনাল রিভিউ', 'মডার্ন রিভিউ', মায় পুরনো 'ক্যালকাটা রিভিউ' পর্যন্ত তাঁর সন্ধানে ছিল।

ওয়েলিংটন পাড়ায় একদিনের কথা বলি। বই নাড়াচাড়া করতে করতে দেখি বিদ্যাসাগর বাণীভবনের গাড়ি দাঁড়িয়ে। গাড়ি থেকে নেমে যিনি স্টলে গেলেন তিনি আমার দিদি মুরলা। বললেন গাড়িতে সুপ্রভাদি (সুকুমার রায়ের স্ত্রী) আর অমিয়াদি (বিপিনচন্দ্র পালের কন্যা) আছেন। তাঁদের ইচ্ছামতো দু'খানা দামি বিলিতি সেলাইয়ের কাজের বই কেনা হল। দু'পা এগিয়ে দেখি বিনয়কৃষ্ণ দত্ত অ্যাটর্নি বিমলচন্দ্র চক্রবর্তীর সঙ্গে বই কিনছেন। সবাই খুব আনন্দ ক'রে চা খেলুম। বিনয়দা বাণীভবনের বাসেও এক থালা মাটির ভাঁড় পাঠালেন, তবে রাস্তার চা ওঁরা খেয়েছিলেন কিনা জানিনে। কত মজার ঘটনাই যে ঘটে—যা ভুলতে ইচ্ছে করে না।

কলেজ স্ট্রিটের মানিকলাল আমাকে বড়বাজারে গুপীকিষেণ খান্নার কাছে নিয়ে যান। লাইট হাউস সিনেমার উল্টোদিকে এক সময় এঁর বইয়ের দোকান ছিল। দোকান উঠে যেতে ইনি বাড়িতেই ব্যবসা শুরু করেন। অজিত ঘোষ, সুরেশ নবতিয়া, নওলখা, রাধাপ্রসাদ গুপ্ত—এঁদের বাড়িতে খান্নাজির ছেলেরা ভালো বই পৌঁছে দিত বলে জানি। পৌনে দু'শ বছর ধরে বড়বাজারে বাস ক'রে এঁরা এখন পুরোপুরি মাড়োয়ারি বনে গেছেন। নতুন পুরনো সবরকম বইয়ের ব্যবসাই করতেন।

শিবরামমূর্তির 'সাউথ ইণ্ডিয়ান ব্রোঞ্জেস' তখন ছাপা ছিল না, সেই যে খোঁজ নিতে গেলুম, তারপর উনি ছবির বইয়ের নেশা ধরিয়ে দিলেন।

কুমারস্বামী, স্টেলা ক্রামরিশ, এন সি মেহতা, মোতী চন্দ, কার্ল খাণ্ডেলওয়ালা, রানধাওয়া, আর্চার, রাজপুত কাঙড়া চীনে জাপানি কত যে ছবি দেখালেন! ক্রমে ক্রমে দেখতে লাগলুম। একদিন নিয়ে গেলেন ছবির নিলামের বাজারে। বললেন, 'মিনিয়েচার ছবি কতটুকু হয়, কেমন হয়, হাতে নিয়ে দেখবেন চলুন।'

রাস্তা তো গোলকধাঁধা—এর বাড়ির উঠোন, ওর বাড়ির র'কের উপর দিয়ে সরু সরু গলি পেরিয়ে একটা চত্বর বা চবুতারা। সেখানে আডময়লা ফরাস পাতা—তাকিয়া ঠেস দিয়ে মাঝবয়সী উজ্জ্বল ঝলমলে চেহারার এক মানুষ, অত্যন্ত তীক্ষ্ণ চোখমুখ, কেমন বাদশাহী ভাব—কথাবার্তা কেউ বলছে না। খান্নাজি তাঁকে ফিসফিস ক'রে কি যেন বলে আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে বসিয়ে দিলেন। ধরাবাঁধা সময়ে ছোট একটি ঘণ্টা নেড়ে সামনে পাতা সিল্কের রুমালের ওপর ছবি পড়তে লাগল—কোটা, বুঁদি আর গুলের। এখন এই তিনটে নাম শুধু মনে আছে। ওস্তাদজি ছবি নিয়ে সামান্য দু'চার কথা বলেছিলেন, লিখে নিতে পারিনি। সমস্তক্ষণ আমার কেমন যেন ঘোরের মধ্যে কাটল। ওস্তাদজি একবার শুধু জিজ্ঞেস করলেন, 'কতদিন ছবি দেখছেন!'

হাতির দাঁতের পাতের উপর আঁকা ছবিও তিনখানা বিক্রি হল। পরিচয় পেলুম ভদ্রলোকের নাম বদ্রীদাস কাপুর—লক্ষ্ণৌ দিল্লি এলাহাবাদে পালা ক'রে থাকেন। ওঁর কাছে নাকি 'বসন্ত বিলাস' আর 'রসমঞ্জরী'-র পুরনো পুঁথি আছে, বেচে দেবেন সরেশ দাম পেলে ইত্যাদি ইত্যাদি। এই নিলামের ঘটনার আট-ন' মাস পরে শুনলুম ছবির লোভে কাপুরজীকে কারা যেন খুন করেছে। ঘটনা অত্যন্ত শোচনীয় তাতে সন্দেহ নেই। তবে ঐ দিনের অভিজ্ঞতা ছবি দেখতে আমাকে এগিয়ে দিয়েছিল।

হাতিবাগান, গোয়াবাগান, বড়বাজার, কলেজ স্ট্রিট, ধর্মতলা, ওয়েলিংটন পেরিয়ে এলে ভালো বইয়ের বাজার ফুরিয়ে আসে। ভবানীপুরের গাঁজা পার্কের উল্টোদিকে একসময় 'যমুনা', 'মানসী', 'বিচিত্রা', 'উদয়ন', 'উত্তরা', 'উপাসনা', 'অভ্যুদয়' —এসব পুরনো পত্রিকা নিয়মিত বিক্রি হতো। সেখানে এখন গামছা-ওয়ালা বসে।

পূর্ণ (থিয়েটার) সিনেমার উল্টোদিকে নকুল, আর ভারতী সিনেমার উল্টোদিকে মেশের আলি পুরনো লোক। একসময় সুভো ঠাকুরের 'সুন্দরম' কাগজের সেট্ এরাই এনেছিল। রাসবিহারীর মোড়ে মার্তাজার ছেলের বইয়ের

স্টল টিমটিম ক'রে চলে। সাতাশি পেরিয়ে মার্তাজা নানা ভাগ্যবিপর্যয়ে এখন সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত।

বালিগঞ্জের ত্রিকোণ পার্কের উল্টোদিকে সুলতানের চালু দোকান ছিল। কাশীর ছাপা কিছু নব্যন্যায় টিপ্পনি, অতি দুর্লভ 'পণ্ডিত' পত্রিকা, এক খণ্ড সত্যব্রত সামশ্রমীর 'প্রত্নকম্রনন্দিনী' সে দেয়। কলেরা হয়ে ছেলেটি মারা গেছে। গোলপার্ক এলাকার বিশ-পঁচিশটি স্টল নিয়ে চব্বিশ পরগনার মণ্ডলেরা বইয়ের ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছেন। অনিল, বসন্ত, সুনীল মণ্ডল—এরা ভালো বই দিত। এখানে দু'-তিনজন মেয়েও নিয়মিত দোকানে বসে।

ফুটপাথ থেকে সস্তায় বই কিনে যাঁরা অন্যত্র বেশি দামে বেচেন তাঁদের নাম বাদ দেওয়া হল। বাকি যা মনে আছে বলার চেষ্টা করলুম। কতকটা নিরুপায় আর নির্লজ্জ হয়ে 'আমি' শব্দের বার বার উচ্চারণ করতে হয়েছে। কিন্তু স্মৃতি-চারণে 'আমি'-কে তো বাদ দেওয়া যায় না!

বই-বই-ভালো বই

বই-বই-ভালো বই—এই বলে 'ডাকঘরে'র দইওয়ালার মতো বইওয়ালারা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে অহোরাত্র ডেকেই চলেছে—কেউ শোনে না, কেউ শোনে। আকাশের খুব শেষ থেকে পাখির ডাক শুনলে যেমন মন উদাস হয়ে যায়—তেমনি করেই ঘরের ভেতরে দীন দুঃখী কোনো কোনো মানুষেরও মন উদাস হয় বৈকি। এইসব ছেলেমানুষি বা পাগলামির ইতিহাস লিখে গেছেন বিদেশের বহু ব্যক্তি। ঐ যে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন—সাহেবরা পাখি মারিলে তাহারও ইতিহাস লেখা হয়। কিন্তু আমাদের দেশে বই-কিনিয়েদের তেমন কোনো ইতিহাস লেখা হয়নি বললে কি খুব একটা ভুল বলা হবে? এটা তো সত্যি যে বই হল সবচেয়ে নিরাপদ নেশা। এ নেশাকে ডালেমূলে উপড়িয়া সাগরে ভাসানো যায় না। সবদিকেই ভালো, তবে দোষ একটিই—একবার ধরলে ছাড়ে না। যেন কালোয়াতী গান; থামতে আর চায় না। নেশাখোর দুটি চারটিকে যাদের চিনতুম তাদের কথা বলবো ভেবে মনে হল আগে দেশের রাজা-বাদশার নাম আর তাদের তোষাখানার ঠিকানা বলে নিই—কেননা তাঁরা বই কিনেছেন, জমিয়ে রেখে গেছেন, তাই তো পড়তে পাই আমরা। আমরা যারা ধুলো ধোঁয়া ভর্তি ঘিঞ্জি শহরে থাকি, শান্ত প্রকৃতির বালাই-ই নেই, সেখানে টেবিলে কি মাদুরের ওপরে বইয়ের মতো সঙ্গী আর কে? সেই তো আমাদের গৌতমবুদ্ধ থেকে মহারানী ভিক্টোরিয়ার সঙ্গে চেনা পরিচয় করায়, পেরিক্লিস থেকে থুকিদিদিসের ফোটো যেন অ্যালবামে ভরে দেয়, কালিদাসের সঙ্গে জন্মান্তরের বন্ধুত্ব গড়ে দেয়।

বই পড়া, বই কেনা, বই জমানো, এ সবই কিন্তু খাঁটি বিলিতি ব্যাপার। আমাদের কেদারবদরী থেকে কালীঘাট পর্যন্ত কোনো তীর্থের কোনো মন্দিরে কিন্তু লাগোয়া লাইব্রেরি নেই। সে যুগে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতেরা বই না দেখেই পড়াতেন। সেটাই ছিল তাঁদের গৌরব। একসঙ্গে বেশি বই বা নানা শাস্ত্র পড়তেও তাঁরা নিষেধ করতেন—বলতেন, 'একা বিদ্যা সুশিক্ষিতা'। অবিশ্যি বৌদ্ধ এবং জৈনেরা তাঁদের পালি প্রাকৃত বই চিরদিন মঠে মন্দিরে, চৈত্যে বিহারে পড়তেন, পড়াতেন আর সংগ্রহ করতেন। সত্যি কথা যে উনিশ শতকেই আমাদের

মিউজিয়াম, এশিয়াটিক সোসাইটি আর ইম্পিরিয়্যাল লাইব্রেরি গড়ে উঠেছে। রামমোহন, রাধাকান্ত দেব, অক্ষয়কুমার দত্ত, মহেন্দ্রলাল সরকার, রাজনারায়ণ থেকে রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন, মাইকেল, হেমচন্দ্র, রঙ্গলাল সকলেরই ভালো সংগ্রহ ছিল। তাঁদের জীবনী আর স্মৃতিকথা থেকে এটুকু জানা যায়। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে বিদ্যাসাগর, রমেশচন্দ্র, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, ঋতেন্দ্রনাথ এঁদের সংগ্রহ যা আছে তা সম্পূর্ণ নয়। বিদ্যাসাগরের বই বিক্রি হয়ে যাচ্ছে শুনে মহারাজা যোগীন্দ্র-নারায়ণ যা বই বাকি ছিল সবটাই কিনে দেশে নিয়ে যান, পরে সাহিত্য পরিষদ রাখবে জেনে আবার লালগোলা থেকে কলকাতায় বইগুলো ফিরিয়ে এনে পরিষদকে উপহার দেন—এ তথ্যটি দিয়েছেন কুমার ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়। ডিরোজিওর ছাত্ররা সকলেই গ্রন্থবিলাসী ছিলেন। তাঁদের একজন রামলাল চক্রবর্তী। বই আর সুরা দুটিতেই তাঁর বিশেষ প্রীতি ছিল। তাঁর অকালমৃত্যুর পরে ভাগাভাগিতে সে প্রকাণ্ড লাইব্রেরি এখন ছিন্নভিন্ন। এঁর প্রপৌত্র বহুভাষাবিদ রামগোপাল অন্ধপ্রায় হয়েও মায়ের আদরে মরা ছেলের মতো ছেঁড়া বইয়ের কিছু অংশ বুকে করে বার্ধক্যে শুধু বেঁচে আছেন।

রাধারমণ মিত্রের বয়স প্রায় ৯৫, তাঁর সংগ্রহের কিছু অর্থাৎ কাছাকাছি হাজারখানেক বই এখনও বেহালার ফ্ল্যাটে পড়ে আছে।

অধ্যাপক সুকুমার সেন মশাই তো সাহিত্য সংসারের 'মাদলা পঞ্জীকা'র বটেই তাছাড়া বইয়ের জগতের কাণ্ডারী আর ভাণ্ডারীও। তুষারকান্তি ঘোষ খুব বড় একজন সংগ্রাহক। বারাসতে 'শিশির কুঞ্জে' তাঁর দুর্গের মধ্যে যাঁরা প্রবেশ করেছেন তাঁদের মুখেই শুনেছি।

শ্রীরাধাপ্রসাদ গুপ্ত পুরোনো বইয়ের জহুরি হিসেবে সর্বত্র পরিচিত। তাঁর বই খুঁটিয়ে দেখতে পাওয়া জীবনের একটা সৌভাগ্য—উনিশ শতকের ব্যক্তি বা বই সম্বন্ধে কিছু জানতে চাইলেই তাঁর কাছে যেতে হয়।

জীবনের ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রের মানুষ হলেও এই চারজনেরই এক জায়গায় মিল—তা হল এঁরা বই ভালোবাসেন শুধু এক ধরনের নয়, বিচিত্র ধরনের। এখনকার যুগে দেশে হাজার হাজার সংগ্রাহক, তাই শুধু এই চারটি নাম উচ্চারণ করেই পুরনোকালে যেতে চাই।

জাতীয় গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত স্যর আশুতোষ, স্যর যদুনাথ সংগ্রহের সঙ্গে সকলেই পরিচিত। ওখানে ক্রমে ক্রমে অনেকের সংগ্রহ জড়ো হয়েছে। যেমন মুর্শিদাবাদের রামদাস সেনের বই, দান করেছেন পৌত্র অনুত্তম। 'বঙ্গদর্শন' প্রথম

খণ্ড প্রকাশের সময় বঙ্কিমচন্দ্র এই লাইব্রেরি ব্যবহার করেছিলেন।

ঐতিহাসিক সুরেন্দ্রনাথ সেনের বই, বারিদবরণ মুখার্জীর অসামান্য সংগ্রহের কিছু অংশও এখানে, যাঁরা দেখেছেন তাঁরাই মুগ্ধ হয়েছেন। লর্ড কার্জনের উদ্‌যোগে বুহার (বর্ধমান জেলার গ্রাম) লাইব্রেরির আরবী ফারসী গ্রন্থরাজি এখানে আসে, এর মালিক ছিলেন মুন্সী সদরউদ্দীন। বেশী কিছু বলার আমাদের অধিকার নেই। চিন্মোহন সেহানবীশের গ্রন্থ সংগ্রহও এখানে। খুব দুঃখের সঙ্গে বলছি সংস্কৃত বাঙলা আর প্রাকৃত বইয়ের সংগ্রহ এখানে ভালো বলে কোনো প্রমাণ পাইনি। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রাচীন বাঙ্‌লা বই ও পত্রিকার সর্বশ্রেষ্ঠ সংগ্রহ ঠিকই, তবে সেখান থেকে বহুমূল্য বই পড়তে চাইলে কিছু পাওয়া যায় না এও সত্যি। যোগেশচন্দ্র বাগল, সজনীকান্ত দাস আর ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বই এখানে সম্পূর্ণ আছে কিনা জানা যায় না! রামেন্দ্রসুন্দর সংগৃহীত বইও থাকার কথা—সব আছে কি?

বিশ্বভারতীতে শুধু কবির সমস্ত সংগ্রহ আছে তাই নয়—ঠাকুর পরিবারের অনেকেরই বই, প্রমথ চৌধুরীর কিছু বই, প্রবোধচন্দ্র বাগচীর সম্পূর্ণ সংগ্রহ, বীরভূমের সিউড়ি থেকে শিবরতন মিত্রের সব বই ছাড়াও পুঁথির অপূর্ব সংগ্রহ এখানেই। সম্প্রতিকালে সতীকুমারের দু'হাজারের কাছে কিছু বই তাঁর স্ত্রী প্রতিভা দেবী এখানে দিয়েছেন। ১৯৪৬ সালের দাঙ্গায় নববিধান সমাজের অপূর্ব গ্রন্থাগার ধ্বংস হয়ে যায় খবর পেয়ে সতীকুমার চট্টোপাধ্যায় যেটুকু পারেন উদ্ধার করেছিলেন জীবনপণ করে।

রবীন্দ্র সরণীতে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের শিবনাথ শাস্ত্রী মেমোরিয়াল লাইব্রেরিতে ব্রাহ্মসমাজের বহু ব্যক্তিই তাঁদের জীবনের সংগ্রহ ঢেলে দিয়েছেন। অতুলপ্রসাদ সেনের নিজস্ব সংগ্রহ কবি নিজেই দিয়ে যান। আচার্য সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত দেশ ছেড়ে চলে যাবার সময় তাঁর বিরাট সংগ্রহের অল্প অংশই নিয়ে যান। যা ছিল সেগুলি কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা নির্দিষ্ট গ্রন্থাগারে স্থান পেয়েছে কিনা মৈত্রেয়ী দেবী বলতে পারতেন। শেকস্‌পীয়র-বিলাসী প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের সংগ্রহ প্রেসিডেন্সী কলেজে আছে। অধ্যক্ষ হেরম্বচন্দ্র মৈত্রের সংগ্রহ সিটি কলেজে আছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষের বিরাট সংগ্রহ তাঁর কলেজ পেয়েছিল কিনা জানা নেই।

অধ্যক্ষ অমিয়কুমার সেনের ভাই অনিলকুমার সেনের বহুমূল্য বই ইদানিং ব্রাহ্মসমাজ পেয়েছেন। সুন্দরীমোহন দাসের পুত্র যোগানন্দের সংগ্রহ এখানে

আছে, হাজারীবাগের দার্শনিক পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ঘোষের সংগ্রহও এখানে। তবু এত সত্ত্বেও রামমোহন প্রকাশিত বঙ্গাক্ষরে ব্রহ্মসূত্র শারীরকভাষ্য, সেই দুর্লভতম বইটি এখানে নেই—আছে সংস্কৃত কলেজে। রামমোহন দ্বিশতবর্ষ জয়ন্তীর প্রবন্ধ সংগ্রহ এখানে নেই, আছে গোথেল সংগ্রহে। গোথেল ছিলেন (তারিখ জানিনে) রোমান ক্যাথলিক পাদ্রী। তাঁর সারা জীবনের সংগ্রহ পৃথক গৃহে রক্ষা করেছেন সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরি এত বিচিত্র এত বৃহৎ যে তার কথা দু'ছত্রে বলা দুঃসাধ্য। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রহ উত্তম বলেই পরিচিত। কবি সুধীন্দ্র দত্তের সম্পূর্ণ সংগ্রহ ওখানে। সাংবাদিক হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের বিপুল সংগ্রহও ওঁরা পেয়েছেন, যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্যের বই ও পুঁথি যাদবপুরে জাতীয় শিক্ষা পরিষদে। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বই, সজনীকান্ত সংগ্রহের একাংশ, অধ্যাপক সুকুমার ভট্টাচার্যের সংগ্রহও পেয়েছেন। কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেকের দান আছে। ঐতিহাসিক নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহের সংগ্রহ থেকে কিছু অংশ এখানে এসেছে। চট্টগ্রামের খাস্তগীর স্কুলের শিক্ষিকা সুপ্রভা দাশগুপ্তের সংগ্রহ এঁরা পেয়েছেন। মুরলীধর গার্লস কলেজে গেছে অধ্যক্ষ নলিনীমোহন শাস্ত্রীর বই, কটকের বেণীমাধব দাসের বেশ কিছু বই আর ইংরেজীর অধ্যাপক মোহিনীমোহন ভট্টাচার্যের বই। চন্দননগরে প্রায় একক চেষ্টায় কালীচরণ কর্মকার ফ্রেঞ্চ ইনস্‌টিটিউট গড়ে তুলেছেন। এসেছে সতীনাথ ভাদুড়ীর বই। শ্রীমতী বাণী রায়ের উদ্‌যোগে বিনয় দত্তের পাঁচশো ফরাসী বই এখানে বহু সমাদরে গৃহীত হয়েছিল। এশিয়াটিক সোসাইটির বয়স দু'শো কবে পেরিয়েছে। সংস্কৃত, আরবী, ফারসীর অসামান্য এবং অনন্য সংগ্রহ এখানে এসেছে। দুটো চারটে খুচরো খবর মাত্র বলি—এখানে এসেছে রাজেন্দ্র-লাল মিত্রের, হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সংগ্রহের বৃহৎ অংশ, অধ্যাপক নির্মলকুমার বসুর সমস্ত বই দিয়েছেন ভাগে বীরেন্দ্র। বৈয়াকরণ ক্ষিতিশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বই দিয়েছেন পুত্র বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়। নর্থ বেঙ্গল বিশ্ববিদ্যালয় পেয়েছে অধ্যাপক ত্রিপুরারি চক্রবর্তীর বিরাট সংগ্রহ। সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সম্পূর্ণ সংগ্রহ তারাশঙ্কর-পুত্র সনৎকুমার এখানে দেন বলে পাটুদার স্ত্রী আমাদের বলেছেন। পাটুদার (পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়) সঙ্গে বিনয় দত্তের বেশি বয়সে বন্ধুত্ব হয়। দুজনেই বই সংগ্রহ করে আনন্দ পেতেন তাই নয়, দিতেনও। ওমর খৈয়ামের কত বিচিত্র সংগ্রহ যে এঁদের ছিল তা বলার নয়। একটি ছিল কারুকার্যকরা কাঠের বাক্স, সেটির মাথায় বোতাম টিপলে ডালা খুলে ছোট

বোতলের আকারে শিশি আর একটি পকেট বই বেরুত। সেটি কোন দেশে কার হেফাজতে আছে এখনও জানতে ইচ্ছে হয়।

কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে মহারাজা মণীন্দ্র নন্দীর কিছু বই, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং প্রমথ চৌধুরীর কিছু বই গেছে। 'ভারত কলাভবন' দেখতে গিয়ে বহুবছর আগে ওখানকার অধ্যাপকমহল থেকে এই খবর পাই। অমলচন্দ্র হোম মশাইকে মিউনিসিপ্যাল গেজেটের সম্পাদক হিসেবে সবাই জানেন। ওঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহটি ছিল বৃহৎ আর বিচিত্র। নিঃসন্তান দম্পতি শেষ জীবনে দু'জনেই অসুস্থ, সম্পূর্ণ অসমর্থ, তাঁদের গ্রন্থাগারের কেউ খোঁজ করলে না—এটি পরিতাপের বিষয়। আচার্য বিধুশেখর শাস্ত্রীর বিশাল সংগ্রহ আমরা একাধিকবার দেখেছি—কি হল তার? অনুবাদের খাতাপত্তরের খবরও কেউ দিতে পারেন না। রামকৃষ্ণ মিশন কালচার ইনস্টিটিউটের বয়স বেশি না হলেও সেটি সুপরিকল্পিত ও সুরক্ষিত। ওখানে গেছে বিধুশেখরের সংগ্রহের একাংশ, অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেনের সংগ্রহ (প্রিয়রঞ্জন সেনের বিবিধ ভাষা সংক্রান্ত বই স্থান পেয়েছে ভারতীয় ভাষা পরিষদে), তাছাড়া ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদারের বিশাল গ্রন্থরাজি। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ছিলেন বেদ ব্যাকরণ আর প্রাকৃত ভাষায় ধুরন্ধর পণ্ডিত। বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া বিদ্যাসাগরেও পড়াতেন। তাঁর অকালমৃত্যুর পরে তাঁর দাদা প্রফুল্ল শাস্ত্রী বইগুলি সংস্কৃত কলেজে পাঠাবার ব্যবস্থা করেন। বই দেখতে আসেন হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় আর গৌরীনাথ শাস্ত্রী। ন'শো বাছাই বইয়ের সঙ্গে প্রচুর খাতা ও নোট, এবং চিঠিপত্রও ওঁরা নেন। সংস্কৃত কলেজের লাইব্রেরি চিরদিনই ভালো। আচার্য গৌরীনাথ সারা বাংলাদেশ থেকে সংগ্রহ কিনে নিয়ে তাকে অসামান্যভাবে সমৃদ্ধ করেন।

এক যুগের খ্যাতির তুঙ্গে ছিলেন অহীন্দ্র চৌধুরী, নাট্যশাস্ত্র, নাটক আর ফোটোগ্রাফ নিয়ে ভালো নিজস্ব লাইব্রেরি গড়েছিলেন। পুত্রেরা সেটির প্রতি এখনও যত্ন নেন। বঙ্গবাসীর নীরেন্দ্রনাথ রায় শেক্‌সপীয়র-চর্চার জন্য বিখ্যাত ছিলেন। অকৃতদার অধ্যাপকের মৃত্যুর পরে তাঁর বই দিল্লীতে ইন্সটিট্যুট অব রাশিয়ান স্টাডিজে গেছে। অধ্যাপক ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষের (ডি. এন. ঘোষ) বিপুল শেক্‌সপীয়র সংগ্রহ বঙ্গবাসী কলেজে গেছে। ইনি ছিলেন নীরেন রায়ের বন্ধু। নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত আইনশাস্ত্রে পাণ্ডিত্যের জন্যে প্রখ্যাত ছিলেন। গল্প-উপন্যাসও লিখতেন। তাঁর সংগ্রহের একটি অংশ পুত্র নির্মল সেনগুপ্তের বাড়িতে দেখেছি। সজনীকান্ত দাসের সংগ্রহ নানাস্থানে ও কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেকটা গেছে।

পুত্র রঞ্জনকুমার দাস সঠিক খবর দিতে পারবেন। যোগেশচন্দ্র বাগলের গ্রন্থ এবং পত্রিকা সংগ্রহ উৎকৃষ্ট ছিল। দৃষ্টিশক্তি হারিয়েও বই লিখেছেন। তাঁর সংগ্রহের অংশ সাহিত্য পরিষদে থাকার কথা। ব্রজেন্দ্রনাথের বই আনুষ্ঠানিক-ভাবে পরিষদে গেছে কিনা চেষ্টা করেও জানা যায়নি। আবার পরে শুনেছি ওঁর স্ত্রী বীণাপাণি দেবী নাকি পরিষদে দান করেছিলেন। গবেষক বিনয় ঘোষের সংগ্রহ অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নে গেছে। পরিমল গোস্বামীর সংগ্রহ তাঁর পুত্রেরা বাড়িতে সম্পূর্ণ রেখেছেন কি? ভালো সংগ্রহ ছিল অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র (শম্ভুদা) মশায়ের, অধ্যাপক সরোজ আচার্যের, দেবজ্যোতি বর্মণের। ন্যাশনাল আর্কা-ইভ্‌সের সৌরীন্দ্রনাথ রায়ের উত্তম সংগ্রহ এখন কোথায় তা তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধুরাও জানেন না। সুশীলকুমার দে মশায়ের বৃহৎ সংগ্রহ পুণায় যাচ্ছে একথা তাঁর চৌধুরী লেনের বাড়িতেই শুনেছি। নীহাররঞ্জন রায় তাঁর সংগ্রহের বিরাট অংশ গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠাতে ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন বাড়ি ও সম্পত্তি দান করার পরে লাইব্রেরি নষ্ট হয়ে যায়। তবে বাসন্তী দেবীর নফর কুণ্ডু লেনের বাড়িতেও শেষদিন পর্যন্ত বইয়ে ভরা আলমারি ছিল। বিধানচন্দ্র রায়, নির্মলচন্দ্র চন্দ্র, নলিনীরঞ্জন সরকার, তুলসী গোস্বামী, কিরণশঙ্কর রায় ও শরৎচন্দ্র বসু সকলের বাড়িতেই নিজস্ব লাইব্রেরি ছিল। শরৎচন্দ্রের সেক্রেটারী ছিলেন অধুনাখ্যাত নীরদচন্দ্র চৌধুরী। কিরণশঙ্করের ভালো লাইব্রেরির কথা ভাগ্নে প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত খুব বলতেন। অতুলচন্দ্র গুপ্তের বিরাট সংগ্রহ প্রতুল-চন্দ্রের পাবার কথা, কিন্তু পাননি, কারণ যে ইচ্ছে, যত ইচ্ছে বই তাঁদের রাস-বিহারী অ্যাভিন্যুর বাড়ি থেকে নিয়ে যেতেন। ফেরৎ দিতেন না। ইদানীং প্রতুলচন্দ্র ক্ষীণদৃষ্টি হয়ে যান। অনেক সাহিত্যিকের নাম করেই বলতেন—অমুক একগাড়ি বই নিয়ে গেছে। ফলে একখানি 'সবুজপত্র'ও তাঁদের বাড়িতে ছিল না। তাঁর নিজের প্রকাশিত কিছু বই আমার আছে জেনে একবার দেখবার জন্যে উৎসুক ছিলেন। কিন্তু তখন আমার চলাফেরা করার ক্ষমতা ছিল না, তাছাড়া নানা যন্ত্রণায় আমি বিপর্যস্ত ছিলাম—দেখাতে পারিনি। এ আফশোস কোনোদিন ভোলার নয়। শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষের খুব ভালো লাইব্রেরি ছিল শান্তিনিকেতনে। নিঃসন্তান মানুষ। 'পরিচয়' পত্রিকার সম্পূর্ণ সেট ছিল তাঁর। সুশোভন সরকার মশায়ের বই তাঁর অধ্যাপক পুত্রকন্যারা সযত্নে রক্ষা করে ব্যবহার করছেন। প্রেসিডেন্সীর অধ্যাপক অমল ভট্টাচার্যের সংগ্রহ তাঁর স্ত্রী সুকুমারী ভট্টাচার্য সযত্নে রক্ষা করে চলেছেন। ধূর্জটিপ্রসাদের সংগ্রহ পেয়েছেন লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়, আর

সংগীতের বইগুলি নিয়েছেন পুত্র কুমারপ্রসাদ। বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ভালো পড়াতেন, ভালো লিখতেন, বইয়ের সংগ্রহও ভালো ছিল। কালিকারঞ্জন কানুনগোর (বাড়ি চট্টগ্রামে) উৎকৃষ্ট সংগ্রহ লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয় পেয়েছে শোনা আছে। রঙীন হালদার মশায়ের সংগ্রহ পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় পেয়েছে—শোনা কথা। সঠিক খবর গোপাল হালদার দিতে পারতেন। পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও বৈষ্ণবশাস্ত্র বিশারদ বিমানবিহারী মজুমদারের দুই পুত্র ভকতপ্রসাদ ও ভগবানপ্রসাদ তাঁর সংগ্রহ পেয়েছেন। কাজী আবদুল ওদুদের রচনার মতোই উৎকৃষ্ট তাঁর সংগ্রহ ছিল। বর্তমান সংবাদ জানা নেই। অধ্যক্ষ যতীন্দ্রবিমলের মৃত্যুর পর পত্নী অধ্যক্ষা রমা চৌধুরী সযত্নে তাঁদের সমস্ত বই এবং প্রাচ্যবাণীর সমস্ত পুস্তক ও পত্রিকা আঁকড়ে রেখেছিলেন। বর্তমানের কথা বলা যাচ্ছে না। বিদ্যাসাগর কলেজের প্রভাসচন্দ্র ঘোষ, ইংরেজীর অধ্যাপক, ১৯২৭ সালে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে লিখে পি. আর. এস. বৃত্তি পান। কত বিষয় যে পড়েছিলেন আর পড়াতেন ! কবি বিষ্ণু দে-র 'স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যৎ' বইটির একটি কবিতা এঁকে নিয়েই লেখা। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুনির্বাচিত বৃহৎ সংগ্রহের খবর দিতে পারবেন তাঁর প্রিয়তম ছাত্র সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত। একযুগের অসামান্য রোমান্টিক গল্প-লেখক মণীন্দ্রলাল বসুর বাড়ি বহুবার গেছি। আমার কাছে 'রমলা' প্রথম সংস্করণ পেয়ে খুশি হয়ে বহু বই দিয়েছিলেন। অতগুলি বাংলা ছোটগল্পের সংকলন আর কোথাও ছিল না। নাম পর্যন্ত শুনিনি। ফরাসী ও জার্মান বইয়ের তিন-চারটি আলমারি ছিল। পাশের বাড়িতে থাকতেন শৈবালকুমার গুপ্ত, এ সম্বন্ধে কিন্তু কিছু জানতেন না যে নিঃসন্তান দম্পতীর এই বই কে পেল ?

ভারততত্ত্বের বিশ্রুত পণ্ডিত আর সংগ্রাহক ছিলেন নরেন্দ্রনাথ লাহা ও বিমলাচরণ লাহা—যথাক্রমে 'ইণ্ডিয়ান হিস্টোরিকাল কোয়ার্টারলি' আর 'ইণ্ডিয়ান কালচারে'র সম্পাদক। যাঁদের বই চোখে দেখতেও সময় লাগত অনেক দিন। নরেন লাহা মশায়ের আংশিক সংগ্রহ তাঁর পুত্র রবীন লাহার অনুগ্রহে দেখতে পাই। কিছু বই আমাকে দেন। তাঁদের বই আর ঘরে নেই। পালি বই লাহা-বাড়িতে বিস্তর ছিল। পালিভাষার একচ্ছত্র পণ্ডিত বেণীমাধব বড়ুয়ার মস্ত লাইব্রেরি ছিল। তাঁর পুত্রকন্যারা সকলেই কৃতী এবং বিশিষ্ট বিদ্বান। কিন্তু ভারত-তত্ত্ব বা পালি সাহিত্য তাঁদের একজনেরও বিষয় নয়। নলিনাক্ষ দত্ত ছিলেন প্রধানত মহাযান বৌদ্ধধর্ম নিয়ে—সে বই-ও বাড়িতে নেই। শিল্প ইতিহাসের অসামান্য সংগ্রহ ছিল পূরণচাঁদ নাহারের বাড়ি। পুত্র বিজয়সিং নাহার নিজে

পণ্ডিত এবং উত্তম সংগ্রাহক, তাঁর কাছে থাকা সম্ভব। বালিগঞ্জে ডালচাঁদ সিংহী বহু জৈন বই মূল প্রাকৃত ভাষায় প্রকাশ করেন। কস্তুরচাঁদ এবং গণেশ লালওয়ানী দুই ভাই প্রাকৃত ভাষায় সুবিদ্বান। বড়বাজারের জৈনভবনে সংগ্রহটি দেখবার মতো। শিল্পশাস্ত্রের আলোচকদের আদি পুরুষ ছিলেন অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় বা ও.সি. গাঙ্গুলী ('রূপম্' পত্রিকার সম্পাদক)। গ্রন্থ সংগ্রহের সঙ্গে তাঁর শিল্পসংগ্রহও বিরাট ছিল। দু নম্বর আশু মুখার্জী লেনে তাঁর সংগ্রহ একটু দেখেছি, বিক্রি করে দেবেন এমন কথাই বলেছিলেন। নিখিলনাথ রায়ের পুত্র অধ্যাপক ত্রিদিবনাথ রায়ের লাইব্রেরি ভালো ছিল। যৌনশাস্ত্রে সুপণ্ডিত। হ্যাভলক এলিস ছাড়াও 'কুট্টনীমতম্' ইত্যাদি বইয়ের উত্তম অনুবাদক ছিলেন। বিজ্ঞান সেবকদের নাম করিনি প্রধানত তাঁদের গ্রন্থাগার দেখে কিছু বোঝার ক্ষমতা নেই বলে।

ভারতের সব প্রদেশের মানুষই কলকাতায় আছেন, দুঃখের বিষয়, যোগাযোগ না থাকায় হিন্দী মারাঠী পাঞ্জাবী উর্দু বা দক্ষিণী ভাষার সংগ্রহগুলি কেমন বা কোথায় তা আমরা কিছুই জানিনে।

আমরা জীবনী এবং স্মৃতিকথা, যা দেখেছি, শুনেছি, দৈনিক ও মাসিক পত্রিকার সংবাদ আমাদের উপকরণ, বংশধরদের মৌখিক সাক্ষ্য, চিঠিপত্র, ডায়েরি, বিশিষ্ট এবং নির্ভরযোগ্য লোকের মুখের কথা গ্রহণযোগ্য বলেই গ্রহণ করেছি। এইসব ভাণ্ডারীদের অনেকের ভাণ্ডারই আমরা একাধিকবার চোখে দেখেছি। এই ধনভাণ্ডারের ব্যাপক অন্বেষণ হোক এই আমরা চাই—তাই এই নামের ফিরিস্তি। পুঁথির জবানীতে একটি প্রাচীন উদ্ভট শ্লোক আছে, সে মানুষকে ডেকে বলছে,—আমাকে চোরের হাত থেকে, বর্ষার কাছ থেকে, আলগা বাঁধাই থেকে (দপ্তরির নয়, পুঁথির বাঁধা), ইঁদুরের উৎপাত থেকে রক্ষা করো। আমাকে পরের কাছে ধার দিও না।

চৌরাৎ রক্ষ জলাৎ রক্ষ রক্ষ মাং শ্লথ-বন্ধনাৎ।
আখুভ্যঃ পরহস্তেভ্য এবং বদতি পুস্তিকা॥

পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ দিক্পাল আলংকারিক, শাজাহান বাদশার সভাপণ্ডিত—এক শ্লোকে চোরেদের গালাগাল দিয়ে বলেছিলেন—'দুর্বৃত্তা জারজন্মানঃ'—নিদারুণ দুঃখ না পেলে তাঁর মতো দার্শনিক মানুষ এমন কথা বলেন কি? ভাণ্ডারী অনন্ত—বিন্দুতে সিন্ধু-দর্শন ঘটানো যায় না, তবু কাঠবেড়ালীর চেষ্টা রইল। আরো অনেককেই চিনতুম। শেষ মুহূর্তে ট্রেনে ওঠার মুখে বাক্স গোছানোর মতো কোনো

কোনো ভাণ্ডারীর কথা তাই ফের গুঁজে দিচ্ছি। যেমন, অতুলনীয় বিনয়কুমার সরকার। ভিক্টোরিয়া ইনস্টিটিউশনে তিনি আসতেন কন্যা ইন্দিরার কাছে। আমাদের ডেকে নিয়ে নানা প্রশ্ন করতেন, একটু মুরুব্বিয়ানা করতেন বাপের গৌরবে। ইন্দিরাই বলেছিলেন, 'ওয়ার্নার মার্টেন কত আর পড়বে? "বিউরি" পড়ো, যিনি পড়ান তাঁর কথা মন দিয়ে শোন, তাঁকে ভালোবাস—গ্রীক ইতিহাস পড়লে, গ্রীক সভ্যতাকে চিনবে—এসব আমার বাবার কথা।' বিনয় সরকার মশায়ের গ্রন্থ শতাধিক, প্রবন্ধ ক'শো জানা নেই। 'বিনয় সরকারের বৈঠক' বইয়ের লেখক হরিদাস ও উমা মুখোপাধ্যায় জানতে পারেন বিনয় সরকারের লাইব্রেরির কথা। অমন ছাত্র দরদী—তাঁকে তখনই 'খ্যাপা', '১৯০৫', ইত্যাদি নানা উপাধীতে ভূষিত করেছিল বিজ্ঞ পাঠক এবং অধ্যাপকেরা। সবশেষে দুঃখের সঙ্গে বলি—সুনীতিকুমারের অপূর্ব লাইব্রেরির কথা। ২০।৩০ হাজার বইয়ের সংগ্রহ কলকাতা পায়নি। পেয়েছে দিল্লি। পুত্র সুমনকুমারের ঔদার্যে। শ্রুতিধর পণ্ডিত নির্মলচন্দ্র মৈত্রের সংগ্রহ তাঁর বাড়িতেই ছিল। 'লোপামুদ্রা' এবং 'অন্তরালে' ছাড়া কোনো নিদর্শন রইল না। সুবোধ সেনগুপ্ত নির্মলের সম্বন্ধে বহুপূর্বেই আগাম অবিচুয়ারি লেখেন N. C. M. নামে।

বই নিয়ে খ্যাপামির কথা অনেক শুনেছি—দু'তিনজনের কথা একটু বলি—এঁদের পয়লা নম্বর বোধহয় কলেজ রো নিবাসী বারিদবরণ মুখার্জি। হোমিওপ্যাথ ডাক্তার, সংসার ছিল, পশারও ভালো। তবু কিন্তু প্রত্যহ নেশার মতো অতবড় চত্বরটা পায়ে হেঁটে ঘুরে নিতেন, একবার নয় দু'বার। পছন্দসই বই পেলে টপ্ করে তুলে নিতেন। ঐ কলেজপাড়াই তাঁর ছিল কাশীক্ষেত্র গয়াগঙ্গা। তা নইলে বিভিন্ন বিষয়ের অমন দুষ্প্রাপ্য বইগুলো কি করে দলবেঁধে তাঁর কূলেই ভিড়লো? বৈষ্ণব পদসংগ্রহ, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বই, নানা গদ্যপদ্য, ল'সনের 'পশ্বাবলী', বিদ্যাসাগর-বঙ্কিমের সব প্রথম সংস্করণ। ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে অনেকটাই গেছে, তারপর পেয়েছেন রাধাপ্রসাদ গুপ্ত। গোলপার্কের মণ্ডলদের কাছ থেকে দু'চারখানি আমিও কিনেছি। কাগজ বিক্রিওয়ালাদের কাছ থেকেও তিনি নিয়মিত বই কিনতেন শুনেছি।

দ্বিতীয় বই পাগল হচ্ছেন সম্প্রতি পরলোকগত সুরেশপ্রসাদ নিয়োগী। সাংবাদিক লেখক সুপণ্ডিত ইদানীং বই ছাড়া আর কিছু জানতেন না। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের মিন্টো অধ্যাপক জে.পি. নিয়োগী এবং রাইটার্সের ব্রজেন নিয়োগীর তিনি ভ্রাতুষ্পুত্র। পিতা ছিলেন কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। সুরেশ অর্থনীতি

নিয়ে বিস্তর প্রবন্ধ লিখেছেন, আসন্নমৃত্যু বাপকে বাড়িতে রেখে পূর্বদিন গেছলেন —'আনন্দমঠে'র প্রথম সংস্করণের পাঠবিচার করতে। রাজা রামমোহনের জন্মসন ১৭৭২ না ১৭৭৪—এ বিষয়ের আলোচনায় তাঁর অধিকার সর্বাগ্রে স্বীকৃতি পায়। ভারত সরকার রামমোহন দ্বিশতবার্ষিক জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে নীহাররঞ্জন রায়ের নেতৃত্বে যে কমিশন গঠন করেন তাতেও সুরেশপ্রসাদ বহু নতুন কথা বলেন। কবির ভাগ্নে সত্যপ্রসাদ প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থাবলী, হিতবাদী সংস্করণ, রবিচ্ছায়া, মিঠে-কড়া এসব তাঁর সংগ্রহে ছিল। বই কেনার ব্যাপারে এমন ব্যস্ত থাকতেন যে মানুষকে চিনতে চাইতেন না। বিদ্যাসাগর-বঙ্কিমের বইসংক্রান্ত সব তথ্য ছিল তাঁর নখ-দর্পণে। ঘরগুলোয় হাজার হাজার বই, বারান্দা ছাপিয়ে নানা যুগের পত্রিকা, বিছানায় বই, মেঝেয় পা ফেলবার জায়গা ছিল না, আরশোলা-ইঁদুরে ভরা ঘরে—কোনোমতে পাশ ফিরে রাতটুকু কাটাতেন। তাঁর মৃত্যুর পরে মেয়ে-জামাইয়েরা প্রায় সব বই বিক্রি করে দিয়েছেন। সুরেশপ্রসাদের বইগুলো কোথাও একত্র রাখতে পারলে দেশের সম্পদ হতো।

বিনয় দত্ত ছিলেন একজন ভালো সংগ্রাহক। সম্পূর্ণ উদাসীন আর অসামাজিক মানুষ। ১৯২৬ কিংবা ২৮ সাল থেকে নাকি বই সংগ্রহ করতেন চার/আট আনা দাম দিয়ে, হাতে পয়সা ছিল না। তারপরে সারাজীবনে হাজার হাজার বই কিনেছেন। বেনামে লিখে, ছাত্র পড়িয়ে আর বন্ধুরাও হয়ত সাহায্য করে থাকবেন। যতীন দাস রোডের দু'খানা সুবৃহৎ ঘরে কয়েক হাজার বই থাকত। গৃহস্বামীর প্রয়োজনে একদা তুলে নিতে হয়। এইসময় দু'জন গ্রন্থ ব্যবসায়ী ঠেলাভরে সেগুলো নিয়ে গিয়ে আর উচ্চবাচ্য করেননি। *Modern Review, Calcutta Review*, 'বিশ্বভারতী কোয়ার্টারলি' ছাড়াও দুষ্প্রাপ্য বহু বই। একথা সঠিক জানতেন অ্যাটর্নী বন্ধু বিমলচন্দ্র চক্রবর্তী। বিনয় কোনো আক্ষেপ করতেন না, দু'চারদিন চুপচাপ শুধু চা খেয়ে বসে থাকতেন। অনেকের বাড়িতে বই রেখেছিলেন স্থানাভাবে, কেউ ফেরৎ দেননি। অনেকের বই প্রকাশ করে দিতেন, প্রকাশন সংস্থাও খুলে-ছিলেন একাধিক, কোথাও নিজের নাম দিতেন না। হাতে টাকা না থাকলে ধারেও বই কিনতেন। পরিমল গোস্বামীর 'আত্মস্মৃতি'তে খানিকটা তাঁর গ্রন্থ-সংগ্রহের কথা আছে। 'দর্শক' পত্রিকা কয়েক পাতার স্মৃতিসংখ্যা বের করেছিল। কেউ চাইলেই এমনকী না চাইলেও কষ্টার্জিত সেইসব বই দিয়ে দিতেন। আমাদের কোনো বন্ধুকে অজস্র ফরাসী বই ডেকে দিয়েছেন। বন্ধু বলেছিলেন এত দামী বই কেন দিচ্ছেন, বিনয় বললেন, পড়বার কেউ নেই, আপনারা পড়বেন।

লর্ড টেনিসনের স্বাক্ষরযুক্ত বই এক সাম্যবাদী পণ্ডিতকে দেন। অক্সফোর্ডের ক'খণ্ডের বৃহৎ অভিধান একজনকে দেন, বাংলা সুবল মিত্রের অভিধান, সংস্কৃত মনিয়র উইলিয়াম্‌সের অভিধান দেন গবেষকের কাজের সুবিধার জন্য। বহু বিষয় পড়েছিলেন, বি. এস্‌-সি আর বি. এল. পাস করার পরে আর কোনো পরীক্ষা দেননি। আইনের বইয়ের সংগ্রহ ছিল খুবই ভালো। যাঁরা নিতেন তাঁরা কতরকম অপবাদ দিয়েছেন গোনাগাঁথা নেই। বলতেন, 'গণ্ডারের চামড়া, আমার গায়ে লাগে না।' বন্ধুভাগ্য ভালো ছিল, এক যুগের বহু মাথাওয়ালা লোকের বিশ্বাস আর স্নেহ পেয়েছেন। নির্মলবাবু বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে নিয়ে যান, একরকম হাতখরচ নিয়ে কাজ করেছেন, তাঁরাও অপবাদ দিয়েছেন। প্রমথ চৌধুরী মশাই খুব স্নেহ করতেন, বিনয় দত্তকে 'রূপ ও রীতি' পত্রিকার সহসম্পাদক করে নেন। চৌধুরী মশাইয়ের তিনখানা চিঠি, যিনি নিলেন ফেরৎ দিলেন না। প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের অকৃপণ স্নেহ পেয়েছেন। নিজের লেখা নিজের বই সম্বন্ধে এমন নির্মম উদাসীনতা দেখিনি। একটি মাত্র ছোট্ট বই মুখে মুখে লেখান—'ঊনবিংশ শতাব্দীর স্বরূপ', তাতে কিছু ভুলের কথা বলাতে বলেন—'থাক, লোকে দেখে খুশি হবে আমি ভুল করেছি বলে।' আধময়লা শার্ট, খাটো ধুতি পরে তক্তপোষে বইয়ের সঙ্গে শুয়ে থাকতেন। মৃত্যুর সময় অভিধান, ফরাসীভাষার কিছু নোট, বালিশের নীচে ছিল। তাঁর কত বই, কত বন্ধু কি দেনা বা পাওনা ছিল তা কাউকে বলে যাননি। ভালোবাসতেন সিনেমা দেখতে, ডিটেকটিভ বই পড়তে, জ্যোতিষ চর্চা করতে। অঙ্ক আর লজিক দুই-ই শেষ দিন পর্যন্ত প্রিয় ছিল।

সেকালিনীর কালি-কলম

প্রথমে গণেশায় নমো বলে যাঁর কথা বলতে যাচ্ছি তিনি হলেন কালীঘাট মন্দিরের বড় হালদারগোষ্ঠীর সর্বপ্রধান শ্রীযুক্ত গুরুপদ হালদার মশায়ের পত্নী।

হালদার মশাই প্রকাণ্ড বিদ্বান, সরস্বতী, দর্শনসাগর, বেদান্তভূষণ। তাঁর মতো দার্শনিক এবং বৈয়াকরণ তাঁর সমকালে আর কেউ ছিলেন বলে জানা নেই। তাঁর রচিত সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হল 'ব্যাকরণ দর্শনের ইতিহাস'। ওজনে খুব ভারী, সাড়ে সাতশো পাতার প্রকাণ্ড বই। সে আবার বাজারে বিক্রি হয় না—তাঁর কাছে চাইতে হয়, তিনি যোগ্য বিবেচনা করলে—দান করেন। এসব কথা বলেছিলেন স্বর্গত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। স্যার আশুতোষের কৃপাধন্য বিদ্বান ব্যক্তি, তাছাড়া শ্রুতিধর। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পালি, প্রাকৃত আর সংস্কৃতের অধ্যাপক।

যাই হোক, এম. এ. পাস করবার কিছুকাল পরেই সাদা বাংলায় হালদার মশাইকে একখানি চিঠি লিখে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই জবাব পেলুম। চিঠির উত্তরখানি হাতে নিয়ে একদিন দুর্গানাম জপতে জপতে হালদারপাড়ায় তাঁর বাড়িতে উপস্থিত হলুম।

সিংদরজা পেরুতেই বিশাল দেওয়াল জোড়া মার্বেল ফলকে বেদ-উপনিষদ আর বেদান্তাদি দর্শনের তত্ত্বগুলি সুলিখিত দেখতে দেখতে কিঞ্চিৎ আবিষ্ট হয়ে পড়ি। আমার চিঠি দোতলায় গেল। মস্ত চওড়া বারান্দায় লালপেড়ে শাড়ি পরা মধ্যবয়সী সুন্দরী এক মহিলা ছিলেন। তাঁকে না ছুঁয়ে অর্থাৎ পায়ে হাত না দিয়ে, টিপ করে পেন্নাম করে বললুম—'আমি কল্যাণী, "ব্যাকরণ দর্শন" চেয়ে চিঠি দিয়েছি।' বললেন, 'বোসো। তোমার চিঠি আমি দেখেচি, একটিও বানান ভুল নেই। সাদাসিদে লেখা, পড়া যায়।'

আমি একটু যেন আহত হয়ে আমৃতা আমৃতা করে বললুম—'আমি তো পাশ করেচি, বাংলা বানানে কেন ভুল থাকবে?' মা-ঠাকরুণ বললেন—'বটে, জানো এম. এ. পাস ছেলেমেয়ে এতখানি বয়সে কতগুনো দেখলুম। যাগ্‌গে বোসো, কত্তার কাছে খবর গেছে।' কতদূর থেকে আমি আসচি, কোথায় বাড়ি, কে কে

আছেন—সব কথা হল। সামনে একখানি অতি সুন্দর বংশীধারী গোপালের পট ছিল। সেটি কী করে পেলেন সেই আশ্চর্য কাহিনী শোনালেন। তারপর বললেন, 'কর্তা কাজ সেরে এখুনি উঠবেন, ততক্ষণ তোমার কথা শুনি।' কী জানি কেন অন্তরঙ্গের মতো বহু কথাই বললেন তারপর। চা খাই শুনে চা করে দিলেন, ঘর থেকে আলাদা কাচের পাত্র এল। পরে নিজে প্রাইমাস স্টোভে রসগোল্লা করেছিলেন, সেই সদ্যোজাত উৎকৃষ্ট রসগোল্লা খেয়ে হাতে যেন স্বর্গ পেলুম। ভয়ও কেটে গেল।

মা-কালীর পুজোয় যেসব ফুল লাগে তার কোনটি গোপালকে দেওয়া চলে একথা বলে তাঁকে আমি আনন্দিত করেছিলুম। তারপর আমার ডাক পরতে চায়ের হাত ধুতে যেতে চাইলুম, হালদার মশাইকে এঁটো হাতে তো প্রণাম করা যাবে না। চায়ের হাতকে এঁটো হাত বলেচি বলে প্রচণ্ড খুশি হলেন। বলে দিলেন, 'আর একদিন এসো। তোমাকে সংসার, চাকরি সামলে সংক্ষেপে পুজো করতে হবে। ধ্যান হবে না—জপ শুয়েও করতে পারো! স্তোত্র পোড়ো, সংস্কৃত শেখাও হবে নামও হবে। দিনের বেলা শিবের স্তব, সন্ধ্যা থেকে মায়ের নাম। গঙ্গাস্তোত্র যখন খুশি।' প্রথম দর্শনে এত কথা কেন বলেছিলেন, এত স্নেহ কেন করেছিলেন বুঝে উঠতে আজও পারিনে।

কর্তাকে বললেন—'একালের এই মেয়ে বলে কীগো, চা খেলে হাত এঁটো হয়? দেখো এই মেয়েকে আমি "পাশ" করিয়ে দিয়েচি, তুমি আগে বই দাও, তারপর কিছু জিগ্যেস করবার থাকলে করো।' আমাকে বলেছিলেন, 'বইটা পড়ার চেষ্টা করো।' ব্যাকরণশাস্ত্রে বিরাট পণ্ডিত ছাড়া তার দর্শনের ইতিহাস আদবেই বোধগম্য হবার নয়, সুতরাং আমাকে কর্তামশাই কী প্রশ্ন করবেন আর আমিই বা কী জবাব দোব?

যাই হোক, কর্তার জ্যেষ্ঠপুত্র ভারতীবিকাশ এসে পড়ায় দু'জনের সামনে বেশ কিছুক্ষণ নানাকথা হল। ঈশ্বরকৃপায় বিচলিত হইনি, তাঁরাও অতি সন্তুষ্ট হলেন। মহাভারত পড়তে বললেন, পারায়ণ করতে পারলে খুবই ভালো এও বললেন। মধ্যে মধ্যে আসবার অনুমতি পেয়েও এমন দুর্দৈব যে বেলেঘাটা থেকে নির্দিষ্ট সময়ে কালীঘাট যাওয়া ঘটে ওঠেনি। এই সময়টা যেন ১৯৫০-৫১ বলে মনে পড়ে।

সরযূবালা দেবীর কথা আগেও বলেচি।

ইনি বারো বছরে বিয়ের পর থেকে সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় পড়াশুনো

করেছিলেন। ডিকেন্সের গল্পের ভক্ত ছিলেন। ডিকেন্সের বাংলা অনুবাদ নেই বলে তাঁর দুঃখ ছিল মনে। ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাস বাংলা ভাষায় নেই কেন? বাংলা ভাষায় ইংরেজি ক্লাসেও বুঝিয়ে দেওয়া হয় না কেন? এসব প্রশ্ন তাঁর মনে জেগেছিল সত্তর বছর আগে। বঙ্গবাসীর ইংরেজিনবীশ অধ্যাপক নীরেন্দ্রনাথ রায় সরযূদেবীর ভাই, তিনি নিজের অনুবাদে 'ম্যাকবেথ' সরযূদেবীকে উপহার দেন। সরযূবালা বাংলা বাইবেল পড়ে প্রায় মুখস্থ করেছিলেন। ছোট ভাই সুধাময়কে, 'ডেভিড কপারফিল্ড' দিয়ে লিখে দেন—

ছোট ভাইটি আমার
এনেছি তোমার তরে চিত্র গল্পহার
লহ যদি হাসি মুখে
আমিও হাসিব সুখে
নতুবা ধূলির সম তুচ্ছ উপহার

তারিখ: ১৩২৯, পৌষ, শ্যামবাজার।

প্রত্যেক বইয়ের উপহারপত্রে আলাদা আলাদা পদ্য লিখে দিতেন। আরও ছিল অত্যাশ্চর্য চেনার ক্ষমতা—ভালো বই, ভালো গান, ভালো ছবি বুঝতেন।

দুষ্প্রাপ্য জিনিসের কদর করতেন। বাড়ি বদলের দিনে খুব ময়লা শাড়িতে মোড়া পুরনো দিনের বিয়ের পদ্য আর থিয়েটারের হ্যাণ্ডবিল তাঁর কন্যা (কোনো কলেজের প্রিন্সিপাল) যা তিনি আমার জন্যে রেখেছিলেন, ফেলে দেন বলে তিনি আমাকে বুকে জড়িয়ে কেঁদেছিলেন। 'ওরে পড়ে পাশ করা যায়, চাকরি করা যায়, রতন চিনতে চোখ চাই, ভালোবাসা চাই।' কথাটা আমার বুকে গাঁথা ছিল।

পারুলদেবীর কথাও অন্যত্র বলেচি--আবার বলি—এরকম গুণবতী মহিলা কম দেখেচি। সংসারের সমস্ত কাজ সামলে, সংসারের বাইরের কত কাজই না জানতেন। দেখতে সুন্দরী ছিলেন, সেজেগুজে সুন্দর পোশাকে যখন বেড়াতেন দৃপ্তভঙ্গিতে, চেনাই যেত না। বাংলায় হেন বই নেই—যা পড়েননি। ইংরেজি নাটক আর কবিতার ভালো অনুবাদ করেছিলেন। বাংলা গল্প-নাটকও লেখেন। দুর্ভাগ্যের কথা এই যে, নিজের লেখায় লেখক-সুলভ মমতা তাঁর একটুও ছিল না। 'প্রবাসী'তে তাঁর গল্প, 'বিষাণে' প্রবন্ধ আমরা পড়েছি। তাৎক্ষণিক বক্তৃতা করার আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল। ছাপরায় রাজেন্দ্রপ্রসাদ—উড়িষ্যার মন্ত্রী বিশ্বনাথ

দাসের সঙ্গে পত্র-ব্যবহার ছিল। চিঠিগুলি এখন নেই। শুদ্ধ আর দেহাতী দুই হিন্দির ওপর রীতিমতো দখল ছিল। লক্ষ্মীনাথ বেজবড়ুয়া আর প্রজ্ঞাসুন্দরী দুজনেই তাঁকে খুব ভালোবাসতেন। কতরকম ছোট ছোট বই লিখেছিলেন—কেন ছাপানো হয়নি জানা নেই।

যে বইগুলি দেখেছি—বলে যাই। ১) 'ফল ও ফুলের বাগান'—পরিশিষ্টে গাছ ছাঁটিয়া দেওয়া ও কলম তৈয়ার করা।

২) 'রোগীর সেবা ও শিশু-পালন'।

৩) 'অল্প খরচে ছোট একতলা বাড়ী তৈয়ারী', ১৯৪০-৪১ সালে লেখা, কোথায় তখন Low-cost Housing পরিকল্পনা ?

বালিগঞ্জের লেক্ টেরাসে ইঞ্জিনিয়ারের দেওয়া নক্সার ওপর দুটি পাকা মিস্ত্রি দিয়ে অতি সুন্দর বাড়ি করতে দেখেছি, সে বাড়ি এখনও আছে। হাজারিবাগ রোডে একদল আনাড়ি মিস্ত্রিকে দিয়ে বড় বাড়ি করেন। কেবল কুয়ো খোঁড়ার জন্যে পাকা লোক আনিয়েছিলেন। কুয়োটি খুব ভালো হয়, বহু লোক জল নিতে আসত। তখন বড় মেয়েকে হারিয়ে দিনের বেলা ঘরে থাকতে চাইতেন না। হয় মালীর কাজ, নয় মিস্ত্রির কাজ, এই দুই নিয়ে ভুলে থাকতেন।

তাঁর লেখা 'তৃণের ফুল' থেকে দু'চার ছত্র তুলে দিই—বই ছাপানো হয় তাঁর মৃত্যুর বেশ পরে।

পুরাতন চিঠি

পুরানো-এ চিঠিগুলা আজি বারে বার
উলটি পালটি দেখি। এ চিঠি কাহার ?
প্রতি ছত্রে কত শঙ্কা কত লজ্জা ভয়
প্রতি ছত্র কত সাধ কত আশাময়।
কত মান অভিমান শুধু একবার
ভালবাসি কথাটুকু শুনিবারে তার।
মিলনের সুখস্মৃতি বিরহের ব্যথা
শোকঅশ্রু এর সাথে রহিয়াছে গাঁথা।
একটি কুমারী কলি মলয় পবনে
প্রেমের কিরণ পেয়ে ফুটিল কেমনে

এ যে তার ইতিহাস। বুক ভরা মধু
দিয়াছিল দয়িতে সে। পান করি বঁধু
তৃপ্ত কি হইয়াছিল? কে বলিতে পারে?
চিঠি দিও—চিঠি দিও ভুল না আমারে।
প্রতি পত্রে ভরা এই প্রার্থনা বিহ্বল
কেন আজি মোর চক্ষে আনে অশ্রুজল? ॥

রচনা ১৯২০

মোর কবিতার খাতার পাতে এই যে আঁচড় কাটা
এঁকেছিল আমার কচি ছেলে।
সেদিন কত রাগ করেছি দেখিয়েছি ভয় তাকে
মা হব না এমনিতর বলে।
আজকে সে নেই নষ্ট পাতাখানা
বুকের ভেতর চেপে ধরে কাঁদি
ভাবতেছিলেম মনে পাতার কোণে কোণে
হাতের আঁচড় আরো থাকে যদি ॥

রচনা ১৯২০

যে আনন্দে ফুল ফোটে বনে
অকারণে,
সে আনন্দ ভারে
মন যার পরিপূর্ণ তারে
হিসাবীরা বেহিসাবী কয়।
হিসাব কে রাখে কার মনে
জগতের খাতার পাতায়
দেখ কত সুমধুর ভুল।
তবু তার তুল
আছে কি কোথায়?

আশা করি, এই দু'তিনটি উদাহরণ থেকেই ইস্কুলে না পড়া মেয়েদের পড়াশুনোর একটু আঁচ পাওয়া যাবে।

পুষ্পাঞ্জলি

আমরা কলেজে পড়বার সময়ে যে পণ্ডিতমশায়ের কাছে পড়তুম, তিনি ছিলেন সংসার-জ্ঞান-বর্জিত অগাধ বিদ্বান একটি মানুষ। পাঠ্যবিষয় ছাড়া আরও পড়াতেন, তাই আমি যখন-তখন তাঁর বাড়িতে গেছি আর যেমন ইচ্ছে পড়ে এসেছি। বারবার যাতায়াত করার ফলে আমি ক্রমে ওঁদের বাড়িরই একজন হয়ে উঠি। একে তো পটলডাঙা অঞ্চলে আমার অনেক কালের যাতায়াত, বই দেখা ও হাঁটাহাঁটির অভ্যাস ছিল, তাই ওঁদের বাড়ি যাওয়াও আমার 'নিত্যকর্মপদ্ধতি'র মধ্যে এসে দাঁড়াল। একদিন বিকেলে গিয়ে দেখি যে মা দোতলার পাট সেরে একতলায় রাঁধতে যাবেন, তাই দুরন্ত খুকুকে শাড়ির পাড় দিয়ে খাটের খুরোয় বাঁধছেন। মেয়েটি বেশ ফরসা মোটাসোটা, পুতুলের মতো—আমরা যাকে বলি থাকুড়থুকুড়,—মাথাভর্তি কোঁকড়া চুল, সেজেগুজে পড়শীদের কোলে চড়েই আদরে-আদরে সে মানুষ হল, ছোটখুকি থেকে তার নাম হল লক্ষ্মী। সে বড় হতে হতে আমার পড়াও শেষ হল, তখন ওদের বাড়ি গেলে দেখতুম—ঘরদোর ছিমছাম সাজানো, আলনায় কাপড় পাট করা, ভিজে গামছা জড়ো করা নেই—দড়িতে মেলে দেওয়া, জুতো, চটি সব পাশাপাশি, এঁটো বাসন গোছ করা, মাজা বাসন পোঁছা জলচৌকিতে ঝকঝক করছে। অতি সামান্য আয়ে মা-ঠাকরুণ অনেকগুলি সন্তান নিয়ে যেন পেরে উঠতেন না। লক্ষ্মী বড় হতেই ঘরদোরের লক্ষ্মীশ্রী ফুটল।

একদিন সত্যিই গেছি লক্ষ্মীপুজোর দিনে—ঘর জুড়ে বিরাট পিটুলির আলপনা, ঘটে আমের ডাল, পেতলের থালায় চিঁড়ে-নারকোল আর তালের ফোঁপল, চুড়ো করা নৈবিদ্যি বাতাসা গুজিয়া কলা কমলা শশা আখ নারকোল সব দু'চার ফালি, ঘরের দোরে, কাঠের সিঁড়িতে মায় গলিতে পর্যন্ত মা-লক্ষ্মীর চরণচিহ্ন। বড় মেয়ের ভালোই বিয়ে হল। পাত্র ডাক্তার, দেখতে সুন্দর। বাড়ন্ত গড়ন বলে তার পর থেকেই লক্ষ্মীর জন্যে সম্বন্ধ দেখা চলতে লাগল। আদুরে মেয়ে বাপকে বললে, 'বাবা, আমার জন্যে ডাক্তার পাত্র দেখো, দিদির যেমন, অমনি যেন হয়, ন্যাড়া মাথা না হয়।' আমাকেও বলেছিল এ-কথা। পাড়ায় কার

কমলাঞ্জলি নাম শুনে নিজের পুষ্পের সঙ্গে অঞ্জলি জুড়ে নিয়ে বলত—'আমি দেবীর পায়ে পুষ্পাঞ্জলি।' কবিতা পড়তে খুব ভালোবাসত, ইদানিং পাশের ঘরের বৌদির পুরোনো হারমোনিয়ম টেনে নিয়ে সরগম সাধবার চেষ্টা করত। বৌদি বলতেন, 'এখন বাজা, পরে তোর বরের কাছে দাম উশুল করে নোব।' দীর্ঘকালের বাস, দোকানে টাকা বাকি রেখে তিনি মেরামত করিয়ে দিয়েছিলেন যন্ত্রটা।

সরকারি ডাক্তার পাত্রের খবর পেয়ে আদুরে মেয়ের জন্যে পণ্ডিতমশাই নিজে গেলেন পাত্র দেখতে। বাড়িতে শুধু ভাবী বর আর তার দিদি, পাত্রের মা কোথায় বেড়াতে গেছেন। বাড়ি অন্ধকার, ঘরদোর কিছুই দেখতে পেলেন না, শুনলেন বাড়িওয়ালা ইলেকট্রিক তার কেটে দিয়েছে। যাই হোক, অতি শুভলগ্নে চারভাইয়ের টাকায় আর পাঁচজনের সাহায্যে বিয়ে হয়ে গেল। ছোটভাইকে ডেকে লক্ষ্মী বলেছিল, 'ভাই, তুই শানাই, না হয় শুধু একটা বাঁশিওয়ালা যোগাড় কর। বাঁশি না বাজলে কি বিয়ে হয়? আমার কোনোদিন হাতে টাকা হলে তোকে নিশ্চয় শোধ করে দোব।' ভাবী বরের স্বভাষ নাম শুনে সে খুব খুশি হয়েছিল।

ক'মাস যেতে না যেতেই পণ্ডিতমশাই এ-বাড়ির চতুষ্পাঠিতে এসে বিষণ্নমুখে বললেন—'জানো মা, লক্ষ্মীদের বাড়িতে পাখা-আলো কিছুই নেই, কোনোদিনই ছিল না। আমি যখন পাত্র দেখতে যাই—যা বলেছিল, বিশ্বাস করেছিলুম। তা-ছাড়া তার নানা কষ্ট। তোমার মা ডেকেছেন, শীগ্‌গির যেতে বলে দিয়েছেন।'

আমি পটলডাঙায় যেতেই মা ঝর্‌ঝর্‌ করে কাঁদতে লাগ্‌লেন আমাকে দেখে। বললেন, 'তোমাদের পণ্ডিতমশাই কি বিয়ে দিয়েচেন গো! ওরা লক্ষ্মীকে ঘরে নেবে না, ফিরিয়ে দিয়ে যাবে।'

আমি তো হতবুদ্ধি, বললুম, 'সে কি! নগদ টাকা, গয়নাগাটি, যা চেয়েছিল সবই তো দেওয়া হয়েছে?' তারপর একটু একটু করে শুনলুম একতলায় ছোট স্যাঁতসেঁতে ঘর, বড় বড় ফার্নিচার ঢুকিয়ে ঘরে জায়গা নেই, নড়তে-চড়তে গুঁতো খায়, তাছাড়া ওরা লক্ষ্মীকে মোটে খাটে শুতে দেয় না। শাশুড়ি খুব দজ্জাল, তাঁর সর্বাঙ্গে বীভৎস শ্বেতী, তাঁকে লক্ষ্মী আগে দেখেনি। হঠাৎ দেখে ভয় পেয়ে বলে উঠেছিল—'ওমা! এ আবার কে?' সত্যিই ও জানত না যে উনিই পাত্রের মা। তখন তিনি বললেন, 'বটে, ভারী স্থন্দর বৌ গো, তোকে বিদেয় করব, নইলে বাপের বেটি নই আমি।'

উঠতে-বসতে বাপান্ত করেও হল না। যেই শুনলেন বিয়ের পর প্রথম মাসেই তার সন্তান-সম্ভাবনা হয়েছে, অমনি বললেন—বাপের বাড়ি থেকে অন্তঃসত্ত্বা মেয়ের বিয়ে দেওয়া হয়েছে। রোজ উনুনের কয়লার ছ্যাঁকা দিতেন, ওর পেটেও ছ্যাঁকা দিয়েছেন। জামাই তো ডাক্তার, সে কি জানে না যে গর্ভের সন্তান তারই? নিজের ব্যবহার স্বীকার না করে চুপ করে মায়ের কথায় সায় দিয়ে গেছে। ওদের বাড়ির ঝি এসে আমাদের বলে গেছে। আমার শুনে অবধি মাথা গুলিয়ে গেছে। 'তুমি তো জানো—দেখতে সুন্দর বলে কোথাও একা যেতে দিইনি। একরাত দিদির বাড়িতেও থাকেনি। ও শুধু ঘর সাজাত, হিরণদিদির দেওয়া হারমোনিয়ম বাজাত, সংসার পাতার বড় শখ ছিল গো।—ক'দিন বাদে দিতে আসবে, আর নিয়ে যাবে না। আমি কি করব—তোমরা বলে দাও। বছর ঘোরেনি, এখনও ছেলেদের বোনের বিয়ের দরুণ সব দেনা শোধ হয়নি।'

এর পর কিছুকাল যেতে জামাতাবাবাজী এসে ও-পাড়ায় কোনো একটা গলির মুখে একটা তোরঙ্গ আর ব্যাগসুদ্ধু লক্ষ্মীকে ফেলে রেখে চলে গেলেন। তাঁর মা দিব্যি দিয়েছেন, তাই সে শ্বশুরবাড়িতে ঢুকবে না। পণ্ডিতমশাই বিরাট একটা ম্যানশনের দোতলায় পাঁচ-ছ'টি পরিবারের সঙ্গে আজীবন একত্রে থেকে গেছেন। কারও সঙ্গে অসদ্‌ভাব ছিল না। মেডিকেল কলেজে লক্ষ্মীর একটি কন্যার জন্ম হবার পর পড়শীরা জামাইকে আসবার জন্য পত্র দিলেন দু'তিনজন—মেয়ের মুখ নাকি বাপের মতোই হয়েছে ইত্যাদি। কোনো সাড়া মিলল না। পড়শীরাই কাঁথা-কাপড়-জামা সব দিলেন। ছোট ঘরখানা লক্ষ্মীকে ছেড়ে দেওয়া হল—যদি জামাই আসেন। ঘরে অকুলোন দেখে লক্ষ্মীর দুই ভাই অন্যত্র চলে গেলেন। শুধু বড় ভাই রুগ্ন স্ত্রী আর ছেলেমেয়ে নিয়ে কাছে রইলেন। পণ্ডিতমশাই আর মা দু'জনেই ভেঙে পড়লেন।

পণ্ডিতমশাই টালার কাছে পাইকপাড়া রাজবাড়ির ছেলেদের বহুদিন পড়িয়েছিলেন, সেখানে পরামর্শ চাইতে কুমারবাহাদুর বললেন, 'পুলিশে খবর দিন, সরকারি চাকরি নিয়ে জামাই বিনা দোষে স্ত্রীকে ত্যাগ করতে পারে না।' কিন্তু নিঃসম্বল বাপমায়ের অতটা ভরসা হল না। পড়শীরা খুব সহৃদয় ছিলেন। বড় করে তত্ত্ব করার মতো মাছমিষ্টি আর লোক দিয়ে লক্ষ্মীকে শ্বশুরবাড়ি পাঠিয়ে দিলেন। ছ' সাতমাস বাদে একটি মেয়েকে কোলে, আর অন্য এক সন্তানকে গর্ভে নিয়ে আবার বাপের বাড়ির দোরে এসে দাঁড়াল। পাড়ার ছেলেরা তোরঙ্গ বয়ে আনলে দুটো গলি পেরিয়ে। তখনই লক্ষ্মী মানসিক ভারসাম্য একটু একটু করে

হারাচ্ছে।—আবার মেডিকেল কলেজ, এবারেও মেয়ে।

পুত্রবধূ খুব বিব্রত, তার ছেলেমেয়েরা পিসিকে খাড়া দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে পড়ায় মন দিতে পারে না। তার উপর দুটো কচি মেয়ের দেখাশুনো। মা-ঠাকরুণ কালীবাড়ি, পীরের দরগা, জ্যোতিষী, জানবাড়ি সব দেখিয়ে মানসিক রোগের ডাক্তারও দেখালেন। ডাক্তার বললেন, 'স্বামীর ভালো ব্যবহার, ভালোবাসা পেলে একটু ফিরতে পারে।' লক্ষ্মী খাড়া দাঁড়িয়ে নিজের মনে হাসত আর মধ্যে মধ্যে কবিতা আওড়াত। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'ঝর্ণা' কবিতাটি তার খুব প্রিয় ছিল —'ঝর্ণা ঝর্ণা' বলে দুই হাত তুলে চেঁচিয়ে বলত—'আমি চন্দনবর্ণা।' শেষ পর্যন্ত দুটি মেয়ে আর লক্ষ্মীকে নিয়ে একরকম জোর করেই মা কুটুমবাড়ি গেলেন। সেখানে শাশুড়িকে বললেন ডাক্তারের কথা। জামাইকে বোঝাতে গেলেন, তিনি মুখ ফেরালেন। মায়ের খাওয়ার দায়িত্ব ওরা নিতে চাইলে না, তখন তিনি চিঁড়ে-মুড়ি খেয়ে রান্না আর বাসনমাজার কাজ করতে লাগলেন। জামাই মায়ের সামনে লক্ষ্মীকে ঘরে নিতেন না, তবু সেই জ্ঞানচৈতন্যহীন মেয়ের আবার সন্তান-সম্ভাবনা হল। সরকারি ডাক্তারবাবু এবার একজন পিওন মারফৎ শাশুড়ি, স্ত্রী আর নিজের দুটি মেয়েকে শ্বশুরবাড়ি পাঠিয়ে দিলেন।

রুগ্ন মানুষের সেবা করা লোক পুণ্যকর্ম মনে করে, কিন্তু বাড়ির ভেতর পাগল সামলাতে কেউ আসে না। সে যে কী ভয়ঙ্কর কাজ তা লিখে বোঝানো মুশকিল। পণ্ডিতমশাই নিরুপায় হয়ে এসে বললেন, 'মা, তোমাদের দেবানন্দপুরের বাড়িতে আমাকে থাকতে দেবে? আমি গীতা-চণ্ডী পড়ব, পুজো-আচ্চা করব লোকের বাড়িতে। তোমাদের মা লক্ষ্মীকে নিয়ে ওখানেই থাকবেন। আমার ছোট ঘরে রাখা যাচ্ছে না, "ভায়োলেণ্ট" হয়ে পড়ছে। কবিরাজী চিকিৎসা করব, কবিরাজ বগলা মজুমদার আমার বন্ধু, আমিও কবিরাজী পাস করেছি।' কিন্তু তখন দেশে আমাদের গোমস্তামশাই পরলোকে। তাঁর ছেলে অচেনা এক পরিবারকে ঐ বাড়িতে বসিয়ে রেখেছে। দখলকারীরা ধনী হলেও, পাগল মেয়ের জন্য পড়ে-পাওয়া জমি আর বাড়ি ছাড়লেন না।

শুনেছিলুম ওকে কোনো উন্মাদ আশ্রমে রাখা হয়েছে এবং সেখানেই সম্ভবত আছে। পাগ্‌লা গারদের জানলার গরাদ ধরে আমার সেই রূপসী বোনটি কি এখনও আপন মনে কবিতা আওড়ায়? কিন্তু বাঁশীওয়ালার ধার যে তার শোধ করা গেল না!

সে-যুগের দাসীদিদিরা

বালবিধবাদের অসহনীয় জীবনের কাহিনী বলেছি আগেও, 'পিঞ্জরে বসিয়া'-তে, আরো কিছু কাহিনী শুনেছি, দেখেছিও মনে পড়ে—যেমন আমাদের ঘোষ পরিবারের একজন বালবিধবার কথা বলছি। আমার দাদুর জেঠিমা তিনি। নাম হেমলতা। মাত্র ন' বছর বয়সে বিয়ে হয়, বিয়ের দু-মাস পরেই বিধবা হন। স্বামী ভারতচন্দ্র ঘোষের বয়স বেশি ছিল না। হঠাৎ কলেরায় তিনি মারা যান।

আমাদের দেশ অবিভক্ত বাংলার যশোর জেলার নড়াইল সাবডিভিশনের রায়গ্রাম-কলাগাছি গ্রামে ছিল। এই হেমলতার বাপের বাড়িও ছিল কাছাকাছি গোবরডাঙায়। হেমলতা ঐ বিয়ের লগ্নেই শ্বশুরবাড়ি আসেন—তারপর বাপের বাড়ি চলে যান। সেখানেই দু-মাস বাদে স্বামীর মৃত্যুসংবাদ পৌঁছায়। আমার ঠাকুমার মুখে শুনেছি, সবাই মিলে যখন তাঁকে ঘাটে নিয়ে গিয়ে শাঁখা-সিঁদুর মুছে ফেলার কাজটি সেরে ফেলতে যাচ্ছে, তার আগেই কোন ফাঁকে উনি হাতের কাঁচের চুড়িগুলি কোঁচড়ের মধ্যে লুকিয়ে ফেলেছিলেন। কিন্তু তাঁর ঐ সাধও পূরণ হয়নি। কোঁচড় থেকে চুড়ি ছিনিয়ে নিয়ে—তা ভেঙে ফেলা হয়েছিল। দেখে কান্নায় ভেঙে পড়েন তিনি।

হেমলতার বাবা নাকি বলেছিলেন, মেয়ের আবার বিয়ে দেবেন। সেইসময়ই তাঁর শ্বশুরকুল বংশের বউয়ের পরকালের কথা ভেবে যথেষ্টই ব্যস্ত হয়ে ওঠেন এবং বাপের বাড়ি থেকে তাঁকে তাড়াহুড়ো করে নিয়ে আসেন। সেই থেকে জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত তিনি মৃত স্বামীর সংসার পালন করে গেলেন। কার অসুখ, কার ঘরে বাচ্চা হয়েছে তার আঁতুড় দেখাশোনা, কারও আবার মা-মরা বাচ্চাকে বড় করে তোলা, এভাবেই ষাটটি বছর কাটিয়ে তাঁর জীবনের মেয়াদ ফুরোয়।

প্রশ্ন জাগে, এঁদের মনের খবর কি কেউ রাখলো? যদিও স্বামীর ঘরের ছাদটুকু আর পেটের ভাতের সংস্থানের ভাগ্যটুকু তাঁর হয়েছিল। হতভাগ্য এই বালবিধবার সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়ের সুযোগ আমার হয়নি। যোগেশচন্দ্র কলেজের অধ্যাপিকা শ্রীমতী কবিতা ঘোষের কাছ থেকে কাহিনীটি পাই।

আরো একটি ঘটনা, ঠিক কবেকার—তা ষাট বা বছর সত্তরের কাছাকাছি সময়ের ব্যবধান হতে পারে। এক ধনী পরিবার। বনেদী এবং বৃহৎ। এঁদের অদ্ভুত একটা নিয়ম ছিলো, বিয়ের অষ্টমঙ্গলার পর থেকে পুরো একটা বছর স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দেখাসাক্ষাৎ করার নিয়ম ছিলো না। এই বিশেষ নির্বাসনকাল তারা কিভাবে কাটাবে তা ঠিক হতো দুই কুটুমবাড়ির পুরোহিত আর বেয়াই-বেয়ানদের কথাবার্তার মধ্যে দিয়ে। এখন রাসবেহারীর মোড়ে যে বিশাল চারতলাটা রয়েছে, শুনেছিলুম তা এঁদেরই ছোটতরফের সেজ মেয়ের বাড়ি। এদিকে পারিবারিক ঐ নিয়মের গণ্ডী এতই কঠিন ছিলো যে নির্বাসনপর্বের মধ্যে স্বামী বা স্ত্রীর কারোর কোনো গুরুতর বিপদআপদ, অসুস্থতাতেও তাদের পরস্পরের দেখা-সাক্ষাতের কোনোই উপায় ছিলো না। আমাদের চেনা অতি সুন্দরী এক দিদিমণি এই অদ্ভুত একুশে আইন মেনে স্বামীর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হবার কিছুদিন পর পরই তাঁর স্বামী মারা যান। যতদূর জানি তাঁর বাবা—মেয়ের এ-হেন সর্বনাশ দেখে তাঁর ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করেই বিশাল সম্পত্তি, জমি-জমা তাঁর নামে লিখে দিয়ে যান। তবুও কিন্তু তাঁর জীবনে তিনি সুখের মুখ দেখেননি। শ্বশুরবাড়িতেই প্রায় অর্দ্ধাহারে কোনোমতে দিনগুলো কাটিয়ে দেন। বরাদ্দ ছিল রাতে কোনো কোনো দিন দুধ-ছানা, কোনোদিন বা সামান্য সবজী বা ডাল। সে নিয়মের বেড়া এতই কঠিন যে বাপের বাড়ি এলে সধবাদের পরিবেশিত আহার্যও ছিল নিষিদ্ধ। ছোঁয়া বাঁচিয়ে বিশুদ্ধ থাকার এই বিধান। বিয়েবাড়িতে এঁদের জন্যে আলাদা খাদ্যবিধি। রান্না তো দূরস্থান, সধবার ছোঁয়া রান্নার উপকরণও ব্যবহার চলতো না। শিশুর জন্মের পর প্রথম প্রথম কিছুদিন আঁতুড পানে যাওয়াই বারণ। সেই দিদি একটা ছবি, রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তি ওঁ-কারের মধ্যে দিয়েছিলেন, দেখলে এখনও তাঁর কথা মনে পড়ে। মাত্র ১১/১৩ বছর বয়সেই স্বামী হারিয়ে ষাট বছর বয়স পর্যন্ত তাঁকে এই ঘানি ঘোরাতে দেখেছি। সত্যিই সুন্দরী ছিলেন, অথচ যে-কোনো শুভকাজ, ভালো কাজে হাত লাগানোরও উপায় ছিলো না তাঁদের, যেমন সেলাই-বোনা ইত্যাদিও। অনাদর, অবহেলার এ জীবন তাঁর কবে শেষ হয়েছিল আজ আর মনেই পড়ে না। আর কেই-বা খোঁজ রাখতে চায় এইসব অবহেলিতার ঠিকানা-ঠিকুজি!

ছড়ানো শৃঙ্খল

কিন্তু শুধুই বালবিধবারা কেন? মেয়ে হবার সুবাদে বাধা নিষেধের শৃঙ্খল

এতদুর ছড়ানো ছিল, যা আজ ভাবাই কঠিন। কুমারী মেয়েদের নিঃসম্পর্কীয় পুরুষের সঙ্গে কথাবার্তা, মেলামেশা তো বটেই, রাস্তাঘাটে একলা বেরোনো, এমনকী বাড়ির জানালায় দাঁড়ানোও ছিল রীতিমতো দোষের। ভাই বা দাদারা থাকলে ছাড় মিলতো। এই যে তোমাদের পত্রিকাতেই বয়ঃসন্ধির সমস্যা প্রসঙ্গে লিখেছো, এসব নিয়ে কতরকমের যে ভুল ধারণা থাকতো ইয়ত্তা নেই। যেমন, বলা হতো যে ভগবান ঘুমোনোর সময়, মেয়েদের দেহে শিশুকে রেখে যান। এই ভয়েতেই হাঁ-মুখ করে ঘুমোতাম না, যদি··· । বয়স্ক মেয়েদের ছাপা শাড়ি পরা বারণ। বিধবাদের বরাদ্দ আলোচালের ভাত, কেননা সেদ্ধ চাল নাকি কে বা কোন জাতের হাতে সেদ্ধ হয়েছে ঠিক নেই। যদিও আলোচালই বা কার ঘর থেকে কোন পরিচর্যায় এসে হাজির হল তার খোঁজ করত না কেউ। মনে পড়ে, একবার 'উদয়ের পথে' দেখাতে নিয়ে যাবার জন্যে ভায়েরা খুব ধরেছিল। বাড়ির ভয়ে যাইনি। আরেকবার কি একটা বই দেখে এসে দাদা ও বড়দের কাছে ভয়েতে মুখ তুলে তাকাতে পারিনি। নাম উচ্চারণ তো দূরস্থান। তারপর যদি সে নামও শ্লীলতার গণ্ডী পেরোয়—যেমন ছিলো—'সহধর্মিণী', উচ্চারণেও যা দূষণীয়। এরকমই একটা ব্যাপার ছিল—গৃহশিক্ষকদের কেন্দ্র করে। ছাত্রীদের—পুরুষ গৃহশিক্ষক ব্যাপারটা বহু বাড়িতে এখনও অস্বস্তিকর হিসেবেই রয়ে গেছে, তবু তখনকার দিনে এ বিষয়টা যে কিরকম সংশয়, সন্দেহ তৈরি করত অন্দরমহলে, একটা উদাহরণ দেবার লোভ সামলাতে পারছি না। আমারই এক বান্ধবীর কাছে শুনেছি যে তার পড়া চলাকালীন ঘরের দোরগোড়ায় নজরদারি করতে একজন ঝিকে বসিয়ে রাখা হতো। পড়তেও হতো জোরে জোরে চেঁচিয়ে, যাতে মার কানে পৌঁছোয়। সবসময় দাসীকে পাহারায় রাখার সমস্যা এড়াতে ঘরের কোনো একটা সুবিধেজনক জায়গায় প্রমাণ সাইজের একটা আরশি রাখা থাকত। পড়ার সময় যাতে শিক্ষক-ছাত্রীকে দূর থেকেই চোখে-চোখে রাখা যায়। সেই বান্ধবীটির (উমা মৈত্র) মা তাকে বুঝিয়েছিলেন যে পড়া না করে শিক্ষকের সঙ্গে গল্প করলে আরশিতে তার মুখ ঘোড়ার মুখের মতো লম্বা দেখাবে। পড়ার ফাঁকে ফাঁকেই সে উঠে গিয়ে আরশিতে ভালো করে মুখ দেখে আসত। এ-নিয়ে শিক্ষক-মহাশয় তাকে প্রশ্ন করলে সে বলেছিলো, মাঝে মাঝেই আমার মুখটা খানিকটা একদিকে বেঁকে যায় কিনা—তাই দেখে আসি।

দাসীদিদি

আমাদের সেকালের জীবনের এইসব ছোটবড় বাধা-বিপত্তি, পতন-উত্থান, নিয়ম-নিষেধের বেড়া ডিঙোবার ব্যর্থতা-সাফল্য, কান্না-হাসির পালার মধ্যেই মিশে ছিল আরো অনেকরকম মানুষের প্রাণপাত। যাদের ছাড়া আমাদের চলে না অথচ যারা আমাদের সব কিছুতে কম বেশি অংশ নিয়েও কোনোদিনই আমাদের কেউ হয়ে ওঠে না, আমরাও হই না কেউ তাদের—সেকালে আমাদের সেই ভুলে যাওয়া দাসীদিদিদের গল্পও বলি একটু। সত্যিই আমাদের চলত না তাদের ছাড়া, তবু কেই বা মনে রেখেছে তাদের, আর রাখলেও সেসব ভেবে মুহূর্ত অপচয়ে লাভই বা কি? তবু দাগ মিলোয় কই?

লেখাপড়া শিখে দেখো তুমি কতকিছুই জানো না, বোঝ না, না পড়েই যা আমি জেনেছি, বুঝেছি···আর কত জানবো? কতদিন তুমিই বা পারবে আমাকে পড়াতে?

অজস্র বিস্মৃতির মধ্যেও গিরিবালার এই কথাগুলি যেন কানে লেগে থাকে। আমাদের বেলেঘাটার বাড়িতে, এক গা গয়না পরে বাসন মাজত। কাজের মেয়ে বলার রেওয়াজ সে যুগে ছিল না, আমরা সবাই বলতুম, ঝি। সেজেগুজে পরিষ্কার সাদা কাপড় পরে সে প্রথমে বাটনা বাটতে বসতো। যদিও সে বাটনায় তৈরি রান্না আমার বাড়িতে কুমারী বা সধবারাই খেতে পারতেন। সধবার হাতের ছোঁয়া বাঁচাতে বিধবাদের সে রান্না খাওয়া নিষিদ্ধ ছিল। যদিও বাজারে নানান হাতের ছোঁয়ায় তৈরি প্যাকেটে পোরা গুঁড়ো মশলার বেলায় তাঁদের সে বালাই ছিল না। যেমন এই বজ্র আঁটুনির গেরো ছিল ভাতের ক্ষেত্রে—চাল নির্বাচনের বেলাতেও। বিধবাদের বরাদ্দ হতো আলোচাল, সেদ্ধ চাল কে সিদ্ধ করল সেই গূঢ় কথা চিন্তা করেই, আলোয় শুকোনো আলোচালের ভাত খাওয়া চলত। দেখা হতো না সে চাল কোথা থেকে, কার পরিচর্যায়, কিভাবে এসেছে। বয়স্ক মেয়েদের ছাপা শাড়ি পরাও বারণ ছিল।

যাক, সেসব অন্য কথা—মেয়েদের দিনযাপনের গ্লানির কথাতেই ফিরে আসি। ফিরে আসি গিরিবালার প্রসঙ্গে। তার কাছ থেকে আমরা যে ভালোবাসা পেয়েছি, সে কথা ভোলা আমার পক্ষে অসম্ভব, এর পাশাপাশি তার যত মনোযোগ ছিল মায়ের প্রতি। মাকে সে ভীষণ ভালোবাসত। বাটনা বাটার পর শুরু হতো উত্তরের ছোট ছাতে মাছ কোটার পালা। কেষ্ট নামের চাকরকে এই সময় ডেকে নিত।

কুচো আর পোনা মিলিয়ে এক টাকার মাছে ছাত বোঝাই হয়ে যেত। আমার কাজ ছিল সেখানে বসে ছোট্ট আর ভোঁতা একটা কাটারি দিয়ে কাক তাড়ানো। বাসনকোসন মাজা তার ছিল একটা দেখার মতো জিনিস। কাঁসার জিনিসপত্র—থালা, গেলাস দেখলে মনে হতো যেন সোনা। লোহার কড়ার দু'পিঠ জলজ্বল করত। মাজার পর ন্যাকড়া দিয়ে মুছে কড়ার পিঠে সরষের তেল মাখানোর পালা। মাছ কুটতে বসে সে আমাকে নানারকমের মাছ চেনাত, কিন্তু হায়, পরের দিন পর্যন্তও সেসব মনে থাকত না আমার। মাকে বলত সে—'মা, তোমার এই কোলপোঁছা মেয়েটা একেবারে হাবা, শুধু চিংড়িমাছ চেনে। রোজ আমি কত করে চেনাই, তবু বলতে পারে না। মাছ চেনে না, শাক চেনে না, ডাল চেনে না, বিয়ের পর শ্বশুরবাড়ি থেকে তোকে ফিরিয়ে দেবে।' আমি বলতুম, 'শ্বশুরবাড়ি যাব না আমি, তোমার বাড়ি গিয়ে থাকব।' রোজ রোজ এই একই কথা শুনতে শুনতে মা একদিন বললেন—'দুগ্‌গা দুগ্‌গা, ও আবার কি কথা!' আমি তার বাড়ি যাবোই এই বায়না করে, একদিন কেষ্ট চাকরকে নিয়ে গেলুম তার বাড়ি। অবাক হয়ে গেলুম বাড়ির মেয়েদের দেখে, কেমন যেন অন্যধরনের মানুষ এরা। গয়নাগাটি তো গিরিবালাও পরে, তবে এদের গালে রঙ কেন? কেউ কেউ আবার বিড়িও টানছে। সেই অভিজ্ঞতার ধাক্কায় কেষ্টর হাত ধরে চোখ বুজে রইলুম ভয়ে ভয়ে। কেষ্ট বললে, 'খবর্দার বাড়ি ফিরে এসব কথা বলবি না, তা'লে তোকে ফেলে আমি নিজের দেশে চলে যাবো।' এভাবেই বাড়িতে দুটো-চারটে মিথ্যে বলতেও শিখলুম কেষ্টর কৃপায়। বাড়ি বোঝাই লোকজন, যে যার নিজের কাজে ব্যস্ত, কেউ চেষ্টাও করত না তলিয়ে বোঝার। এভাবে দিন গড়াতে লাগল, আমিও কয়েকবছরে খানিকটা বেড়ে উঠেছি।

এইসব ঝিদের সঙ্গে মায়ের সম্পর্ক ছিল অদ্ভুত রকমের স্নেহপ্রবণ, তিনি নানাভাবে এদের সাহায্য করতেন, এরাও ভালোবাসত তাঁকে একান্ত আপনজনের মতোই। মনে পড়ে, একবার খুব বিপদে পড়ে গিরিবালা তার সোনার গয়না বেচতে দিল মাকে। মা সেই গয়না দেখে স্যাকরাকে ডেকে পাঠালেন বাড়িতে। স্যাকরা খানিক গয়নাগুলো দেখতে দেখতে, 'অমুক···লাল (নাম মনে নেই) আবার কে গো!' এ গয়না ঝি-এর একথা শুনে সে বললে, 'এসব উৎপাতের গয়না ঘরে রেখেছ কেন মা? বিপদে পড়ে যাবে, হয়ত চোরাই জিনিস!'—এই গয়নার দাম সে অনেক কম দেবে বলায় গিরিবালা মনের দুঃখে নিঃশব্দে কাঁদতে লাগল।

মাসিপিসিরা সবাই-ই শুনে বললেন, 'গেছে গেছে, আপদ গেছে···বিদেয় কর।' তার সোনার তাগাটি কোনো দিদি নিয়ে গেলেন, কিন্তু তিনিও গিরিকে কম টাকাই দিলেন। মৃদু অনুযোগের সুরে 'বড়দিমণি কম টাকা দিয়েছেন', গিরি একথা তোলায় মাও বিরক্তই হলেন। পিসিরা বললেন—'যতসব আদিখ্যেতা। ওসব বজ্জাত মেয়েছেলেদের গয়নাগাটি কাঠি দিয়েও ছুঁতে নেই,···বস্তির লোকজন। ওদের সঙ্গে আবার অত মেলামেশা কিসের? বৌয়ের যেমন কাণ্ড, ছিঃ ছিঃ।' সবাই চুপ করে থাকার উপদেশ দিলেন। যেন বাবা-দাদাদের কানে না যায়, তাহলে সাংঘাতিক কাণ্ড হয়ে যাবে। চুপ করে রইলেনও।

এত বছরের সেবাযত্ন, গিরির প্রতি বিশ্বাস—সবই কি অনায়াসেই বদলে গেল?

ক'মাস ছুটি নিয়ে সে বাড়িতে শুয়ে রইল। অসুখ। কেষ্ট দেশের বাড়ি যাবার সময় বলে গেল হাওড়ায় জানের বাড়ি গিয়ে শুণিয়ে দেখলে হয়। ও আর বাঁচবে না। ভুলতে পারলুম না গিরির কথা, নতুন চাকরকে বখশিসের লোভ দেখিয়ে খোঁজ নিতে পাঠালুম। ফল হল না, বাড়িউলির নাম জানা ছিল না। গিরি তখন পরিত্যক্তা। ঘরে মানুষজনও আসে না। আবার কিছুকাল পরে গিরির গঙ্গাযাত্রায় একটা কমবয়েসী টেরিকাটা ছেলে এসে সাহায্য চাইলে। যে গিরি ছিলো আমাদের সংসারে এত আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে তার সেই শেষযাত্রার পারানিটুকু—সংগ্রহ করতে এলে সে রকম কোনো সাহায্যই পারলুম না করতে। মনে আছে, দু'-পাঁচ টাকা মাত্র দিয়েছিলুম। কি যেন শুচিবায়ুতে পেয়ে বসল। অথচ ওর সে কথা আজও ভুলিনি,—'মরে গেলে তুই আমায় গয়ায় পিণ্ডি দিস।' আজও সে কাজ হয়নি। আমার হয়েও সে কাজ করাতে কাউকেই রাজী করতে পারিনি। কে জানে ওদের মতো ছোটখাটো মানুষের সামাজিক গণ্ডীতে হয়ত ঈশ্বরও নেই, নেই জাতরক্ষার বিধানও।

মনে আছে এই গিরিকে কিছুটা লেখাপড়া শেখানোরও চেষ্টা করেছিলুম। কিন্তু সে চাইতো না পড়তে—বলতো, 'এই এত এত পড়েও তুমি তো কতকিছুই জানো না, যা আমি জানি, এ জীবনে কতকিছুই তো জানলুম শিখলুম, আর পড়াশোনা শিখে কি হবে? তুমিই বা কতদিন পড়াতে পারবে আমাকে?'

'তোমরা মনে করো ভালোবাসতে তোমরাই কেবল জানো।'

চারুবালার বলা এই কথাগুলো ভুলতে পারিনি আজও। অল্প বয়সেই স্বামী, সন্তান হারিয়ে এসেছিল। আমাদের বাড়িতে কাজ করার সময় এখানে যে-লোকটির সঙ্গে তার যোগাযোগ ছিলো সে প্রায়ই তাকে চিঠি লিখতো, বাবুকে বলে কিছু টাকা নিয়ে সে দোকান করবে, তখন সে চারুকে নিয়ে যাবে। সে ছিল নাকি কোনো বড় অফিসারের বেয়ারা। চারুর স্বামী, সন্তান হারানোর খবর শুনেছিলুম পরে। দেশে কলেরায় তার স্বামী, শাশুড়ি আর ছোট ছেলেটা মরে গেছে।

এই চারুবালার একটা নেশা ছিলো গান শোনা। গান শুনতে বড় ভালোবাসতো। সেসব অবশ্যই সেকালের একটু হালকা গোছের গান। দুর্গাপুজোর প্যাণ্ডেলের গান বড় মন দিয়ে শুনতো। এদিকে ঐ হল্লা থেকে বাঁচতে আমরা হয়তো জানালা বন্ধ করে দিতাম, দেখে সে বলতো, 'ও মা! এমন কর কেন? গান কি রাক্ষস? না গান শুনলে জাত যাবে।' মোটামুটি সুর বুঝতো সে।

পুজোর দিনগুলোতে ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে সুসজ্জিতা মেয়েদের চলাফেরা দেখতো সে। মনে পড়ে, সে বলেছিলো—'এত সুন্দর গান, এত সুন্দর সুন্দর জামাকাপড় দেখে দেখেই সময় কেটে যায়, খিদের কথা মনেই থাকে না।' আমি ছোট বয়সে সাদা কাপড় পরতুম বলে সে রাগ করতো। বলতো, 'বিয়ের পর পরতে তো হবেই, এখন থেকেই রঙিন, ছাপা শাড়ি কেন পর না?'

সেও মাকে খুব ভালোবাসতো, মায়ের পুজো করার সময় ঠাকুরঘরের দোরগড়ায় বসে বসে পুজো দেখতো। হঠাৎ একদিন আবদার করে বললে, 'মা, আমাকে মন্তর দেবে?' মা বললেন, 'রাম নাম করো, তাতেই তোমার সব হবে। এত এত মানুষের সেবা করছ, পুজো করার সময় কোথায় পাবে?' মায়ের একটা এনলার্জ করা ফটো ছিলো, সেইটের কপি চেয়েছিলো। এখনও মনে আছে ক'য়েকবার 'দেবো, দেবো' করেও পারিনি দিতে। আমাদের মনের দ্বিধাদ্বন্দ্বের আঁচ করেই বোধ হয় সে বলেছিল, 'দাও না, খুব যত্ন করে রাখবো, আমার ঠাকুরের চৌকিতে। তোমাদের মা তো আমাদেরও মা, তোমরা ভাবো তোমরাই কেবল ভালোবাসতে জানো, আর কেউ জানে না, দাও না গো।' সে আর হল কই।

কালিদাসী

কালিদাসী ছিলো শেষ কুড়ন্তি মানুষ, মিষ্টি স্বভাবের মেয়ে। পদবি ছিলো সর্দার কিংবা পর্বত। তারা ক্যাওট। মানে কৈবর্ত। জেলে নয়, হেলে (হাল চষে) কৈবর্ত। আমরা এতশত জানি না শুনে সে খুব অবাক হয়ে বলেছিলো—'এত লেখাপড়া করো, তাতে এসব শেখায় না?' মাত্র ১২ বছরেই সে বিধবা হয়। ভাইপোকে ভালোবাসতো খুব। সেই ভাইপোর নামেই, শৈল-র মা বলে তাকে ডাকা হতো।

আমাকে কড়ায়ের ডাল বাটতে শিখিয়েছিলো। তার উপদেশ ছিলো—শিলের ওপর নোড়া এমনভাবে চেপে রাখতে হবে যেন ছুঁচও না গলে। একবার ডাল পিছলে গেলেই—সব মাটি। শুনেছিলুম এ শহরে প্রথম পা দিয়ে সে নাকি দোকানে ডাল বাটার কাজই নিয়েছিলো আট আনা মাস মাইনেতে। কোনো-দিনও কাজ কামাই করত না। মাঝে মাঝে দেশে যাওয়া ছাড়া। মনে পড়ছে, একদিন সে এসেছে মুখ-চোখ লাল। ছেলেরা বল খেলছিল কোথায়, বল এসে লেগেছে বুকে। তাকে জোর করে শোওয়াই, বলি—বিশ্রাম নাও। পায়ে ওষুধ লাগাতে গেছি, ওই অবস্থায় হাঁ-হাঁ করে উঠেছে। পায়ে হাত দেয়া চলবে না।

অনেক মজার মজার ছড়া বলতো সে, মুখে মুখে পালাগান বাঁধত, লেখাপড়া না জানলেও তার মুখের ঐসব ছড়া আমাকে অবাক করে দিত। এখনও কিছু কিছু মনে আছে।

মহাভারতের কোনো কাহিনীতে আছে, কুবের তাঁর বাগানের সোনার চাঁপা ফুল দিয়েছেন গান্ধারীর হাতে। গান্ধারী দেবেন শিবের পুজোয় অর্ঘ্য। দেবতার সামনে পেঁৗছে দেখেন, শিবের মাথার চারপাশে ফুল আর ধরে না। সেই ঘটনা নিয়ে লোকপ্রচলিত ছড়া:

তোর সন্নচাঁপায় কি হবে লো দুজ্জোধনের মা
শিবের মাথায় ধরে না ফুল
—রাস্তাঘাটের সেই দু-ধারি
সন্নচাঁপার ছড়াছড়ি করেছে যে কুন্তী নারী।

আবার কোনো মানুষকে খুশি করতে কিংবা অমঙ্গলজনক শক্তিকে শান্ত করতে তুলসীতলায় আলো দেবার সময় বলত এরকম:

তুলসী তুলসী বৃন্দাবন
একা তুলসী নারায়ণ॥

কিংবা :

সাঁঝ সলতে সগ্‌গে বাতি
সঙ্গে নাও মা ভগবতী।

আরো একটি এমনই লাইন মনে পড়ছে :

একটি তারা দু'টি তারা
ঐ তারাটি বৌ মরা।

অক্ষরপরিচয়হীন কালিদাসীর স্মৃতিশক্তি আর রসবোধ আমাকে মুগ্ধ করত। ছোট ভাইপোকে ভালোবাসত খুব। একখানা রামায়ণ বই চেয়েছিলো তাকে দেবে বলে। ভাইপোটা খুব চালাক, প্রত্যেক মাসের গোড়ায় এসে কালীর মাইনের প্রায় সব টাকাই নিয়ে চলে যেত। তাকে দিত মোট পাঁচটা টাকা। দেখেশুনে তাকে আমি খুব বকতুম। বারণ করতুম এভাবে সব দিয়ে দিতে। সে কিন্তু একেই তার ভবিতব্য বলে মেনে নিয়েছিলো।

মজাব মজার কথাও সে বলতো খুব। যেমন বর্ষার দিনে অনেক বেলা করে এক চিলতে রোদ্দুর উঠলে বলতো, 'আকাশের যতুনি মেয়েরা চুল শুকোবে, তাই তোমাদের ভগবান ছিঁচকে পোড়া রোদ দিয়েছে।' বিধবা সে, কিন্তু ওদের বিধবাদের মাছ খাওয়া বারণ ছিলো কেবল একাদশীতেই। মাছ খেতে ভালোবাসত। গঙ্গাসাগর মেলায় একবার গিয়ে দেখে মস্ত মস্ত মাছ—খুব সস্তা, অনেকেই কিনছে। তারও ইচ্ছে হল, কিন্তু খেয়াল পড়ল—একাদশী। অনেকেই খেয়ে নিতে বলল, কে দেখছে? কিন্তু কালীর মনে হল, না, তীর্থে গিয়ে পাপ করবে না। হল না ভোলামাছ খাওয়া। আর-একটা অদ্ভুত ব্যাপার, পঞ্জিকার তিথি, নক্ষত্র সব সে বলে দিতে পারতো। কবে দোল, কবে পুজো, স্নানযাত্রা, সবই যেন মুখস্থ। সেই-ই বলেছিলো আমাকে, ঘাতচন্দ্র, দিকশূল এসবের অর্থ কি—আমারই জীবনের সংকট কালগুলোতে। অনেক পাঁচালি, অষ্টোত্তর শতনাম সে আমাকে এনে দিয়েছিলো।

শেষ দিকে তার হাত, পা পড়ে গেছলো। কাজ আর করতে পারতো না। কাজ ছাড়লেও তার ভাইপো-ভাইঝিদের হাত দিয়ে টাকা পাঠাতুম মিষ্টি খাবার জন্যে। টাকা পৌঁছত না।

দেখা করতে কখনও এলে সে বলত, 'টাকা নয়, জিনিস দিও।' তো একবার একটা থানকাপড় পাঠালুম। কিন্তু ঘরে ভালোমতো ছিলো না একটাও। যেটা দিলুম, তার খোলটা যাচ্ছেতাই। মনে পড়ে, মাকে কথাটা বলতে, মা

বলেছিলো—'তোমার দেবার মনই নেই, তুমি তো দাও কর্তব্য করছ ভেবে, তাহলে ভালো জিনিস আর কি করে দেবে?' হয়তো মা ঠিকই বলেছিলেন, কেননা অনেকবারই ভালো কিছু দিতে চেয়েও দিতে পারিনি অনেককেই মনের মতো করে কিছু দিতে। আমার কাকা বড় খাওয়াতে ভালোবাসতেন অপরকে। খাওয়ানোর জন্যে ধার পর্যন্ত করতেন। কিন্তু কোনোদিনও খারাপ খাওয়াননি কাউকে। অথচ আমার বেলায় দেখেছি সবই কেমনতরো হয়ে যেত। তখনকার দিনে একটাকায় ৩২টা মিষ্টি পাওয়া যেত। তো কাকা কত সুন্দর মিষ্টি আনতেন। আর আমি কাউকে আনতে পাঠালে ঠিক যেন তেমন হতো না সেটা স্বাদে, যাক্‌গে সেসব কথা। খালি মনে হয় অপ্রিয় অথচ বড় বেশি স্পষ্ট কথা বলতেন মা। গিরিবালা, চারুবালা, কালিদাসীদের কথাও ঘুরেফিরেই মনে পড়ে।

রামায়ণে পানভোজন

আস্ত একটি ফলের যেমন বোঁটা, খোসা, শাঁস আর বিচি এই চারটি থাকে, বাল্মীকি রামায়ণরূপ অমৃতফলের তেমনই ওই চারটি অঙ্গ কল্পনা করতে বোধ হয় দোষ নেই। এর বোঁটাটি হল আদি রামকথা—যার বয়েস কম পক্ষে হাজার তিনেক বছর। সুত্তপিটকে খুদ্দকনিকায়ের দশরথ-জাতকে পালিপূর্ণ গল্পের আকারে তার শুরু। অর্ধমাগধী ভাষায় বর্তমানে যেসব জৈন রামায়ণ বা 'পউমচরিউ' সেগুলি অতি প্রাচীন না হওয়াই সম্ভব। খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতক থেকে খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতকের মধ্যে এই রামকাহিনী বহু কথা-উপকথা কুড়িয়ে-বাড়িয়ে, সাতটি বড় বড় কাণ্ড ছড়িয়ে, চব্বিশ হাজার সংস্কৃত শ্লোকে মাথা বোঝাই করে, বিশাল বটবৃক্ষের মতো ভারত জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে। এদেশে তো বটেই, ভারতের বাইরে কত দেশে যে সে ঝুরি নামিয়েছে তার আর শেষ নেই। পণ্ডিতেরা এ-নিয়ে বিস্তর লিখেছেন। এক এক দেশে তার এক-একরকম পোশাক। উত্তর ভারতে তুলসীদাসী, বঙ্গভূমিতে কৃত্তিবাসী, দক্ষিণ দেশে কাম্বান, এর কোনোটাই অনুবাদ নয়। ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টি নিয়ে লেখা পৃথক পৃথক গ্রন্থ।

রামায়ণ ফলের শাঁসটি হল—'মধুর হইতে সুমধুর ভাষা ও ছন্দে সমুজ্জ্বল তার কাব্যশরীর।' এ থেকেই উপাদান সংগ্রহ করেছেন অশ্বঘোষ, কালিদাস, ভবভূতি এবং আরও বহু কবি ও নাট্যকার। 'যতকাল পৃথিবীতে নদী আর পর্বত থাকবে ততকাল জগতে রামায়ণ-কথার প্রচারও থাকবে'—এই ভবিষ্যৎ বাণীটি আশ্চর্যরকম সার্থক। এই পুণ্য চরিত্র নিয়েই তো হাজার রকমের উৎসব আর মেলা, রামযাত্রা আর রামলীলা। অযোধ্যা, চিত্রকূট আর কাশীধামের অর্থাৎ রামনগরে কাশী-নরেশের রামলীলা নাটকের মতোই বৈচিত্র্যে ভরা। উত্তর বিহারে জনকপুরে সীতাদেবীর বাপের বাড়ি। সেখানে একটি মুসলমানী ধাঁচের ঝকমকে বাড়ি দেখিয়ে পাণ্ডারা বলেন—এই রাজার বসতবাড়ি, পাশের ক্ষেতেই রাজা বাপ জানকীমাইকে কুড়িয়ে পেয়েছিলেন, এইসব দেখুন তাঁর বচ্‌পনের খেলনা আর দোলনা, ওই উঠোনে হরধনু ভঙ্গ হয়, সেখানে একটা খুব লম্বা সিন্দুক এখনও পড়ে। বিয়ের দিন যে দীপাবলী জ্বলেছিল তা আজও অনির্বাণ। সব দেখেশুনে

ভক্তেরা দিয়ে যান তেল যোগানের চাঁদা। বিঘ্নহরণের জন্যে এখানে ত্রিসন্ধ্যা 'হনুমান চালিসা'র পাঠ চলে। দীনেশচন্দ্র সেনের 'রামায়ণী কথা' আর তাতে রবীন্দ্রনাথের লেখা ভূমিকায়—ভারতবর্ষ রামায়ণকে কি চোখে দেখে এসেছে তার সব কথাই বোধকরি বলা হয়ে গেছে। ওয়াজেদ আলি সাহেবের ভাষায়—'সেই এক ট্রাডিশান সমানে চলেছে।' কাহিনীর সঙ্গে জনচিত্তের এ সেতুবন্ধন ভাঙ্‌বার নয়।

এখন রামায়ণ ফলের বিচিটি হল—ঈশ্বর রামচন্দ্র, যিনি ছিলেন মায়ামনুষ্য, তাঁর নাম। পাঁচালীকার দাশু রায় ঠিকই বলেছেন, 'রামতুল্য নাম' ভূভারতে নেই। বিহার আর উত্তরপ্রদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষের নামের মধ্যে (রামসহায়, রামশরণ ইত্যাদি) তিনিই আছেন। তাঁরই নাম সূতিকাগার থেকে শ্মশানঘাট পর্যন্ত 'সত্য হয়ে' বিরাজ করে। বৈয়াকরণ ভট্টি এই নিয়েই তো একটি অসাধারণ শাস্ত্রকাব্য রচনা করেন—যেখানে প্রতি শ্লোকের এক পিঠে রামকথা, অন্য পিঠে ব্যাকরণের জটাজাল। সংস্কৃত জানা ব্যক্তিমাত্রেই এ-কাব্যের একটি সর্গ অন্তত নিশ্চয় পড়েছেন। ব্যাকরণের কারক প্রকরণে ভারী শক্ত শক্ত বিচার। তাই রামচন্দ্রের নামের সঙ্গে বিভক্তিগুলো জুড়ে দিয়ে শার্দুলবিক্রীড়িত ছন্দে এই উদাহরণ শ্লোক প্রচলিত আছে—যা নিত্য পাঠ করলে মেধার সঙ্গে রামভক্তিও বাড়ে, ব্যাকরণের বৈতরণীও পার হওয়া সহজ হতো, অন্তত টোলের পণ্ডিতেরা তাই বলতেন। শ্লোকটি এই—

> **রামো** রাজমণিঃ সদা বিজয়তে **রামং** রমেশং ভজে
> **রামেণা**ভিহতা নিশাচর চমূ **রামায়** তস্মৈ নমঃ।
> **রামান্নাস্তি** পরায়ণং পরতরং **রামস্য** দাসোৎস্মাহং
> **রামো** চিত্তলয়ো ভবতু মে সদা **ভো রাম** মামুদ্ধর॥

ভারতবর্ষে যে সব বিখ্যাত রামতীর্থ আছে সেখানে তো বটেই, একদা কলকাতা শহরের বড়বাজারে এবং অনেক ধনী বনেদী বাঙালি বাড়িতেও প্রতি শারদীয়া নবরাত্রির সময়ে আদ্যন্ত বাল্মীকি রামায়ণ পাঠের ব্যবস্থা ছিল, যার কিছু এখনও অবশিষ্ট আছে। রামানুজ, মধ্ব, নিম্বার্ক এবং বল্লভ—এই চার বৈষ্ণব সম্প্রদায় রামায়ণ পড়তে গিয়ে পৃথক পৃথক শ্লোকে মঙ্গলাচরণ করেন। কাশীর সঙ্কটমোচন আর সঙ্কটহরণের রামায়ণ পাঠেরও রকমফের ছিল। উত্তর বিহারে রামভক্তির তেজ প্রচণ্ড। ভারী মামলা জিতলে কিংবা গুরুতর সঙ্কট থেকে রক্ষা পেলে ধনী ব্যক্তিকে রামলীলা দিতে হতো। সমস্তিপুর শহরের কোনো বাঙালি ব্যবসায়ীকেও

মামলা জেতার পর 'রামসীতার বিয়ে' দিতে হয়েছিল বলে জানি। বিবাহপর্বের শেষে উক্ত ভদ্রলোককে ভাড়া করা হাতির পিঠে 'রামদরবার' সাজিয়ে সারা শহর ঘুরতে হয়েছিল। গোরখপুর গীতা প্রেস থেকে বোধ করি 'কল্যাণ পত্রিকা'য় সারা ভারতের রামতীর্থের ফর্দ ছাপা হয়েছিল। খাস কলকাতা শহরে একটি অতি সুদৃশ্য মির্জাপুরী লাল বেলে পাথরের রামসীতার মন্দির আছে, যে মূর্তি মার্বেলের নয়, সম্ভবত অষ্টধাতুর। আর. আমেদ ডেন্টাল কলেজের পেছনে হঠাৎ প্রথমে দেখে মনে হয়েছিল স্বয়ং বজ্‌রংবলী কাশী থেকে এটিকে কাঁধে তুলে এনে রাতারাতি শেয়ালদায় বসিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেছেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ দক্ষিণ ভারত থেকে যে অষ্টোত্তর শত নামমালা সংগ্রহ করে আনেন, এখনও তা বহু ভক্তের নিত্যপাঠ্য।

এখন এই 'শতনাম', 'সহস্রনাম', 'রামগীতা', 'রামরক্ষা', 'রামকবচ', 'রামবীজ', 'রামগায়ত্রী' ইত্যাদির অর্থাৎ শাঁস আর বিচির ভারেই কিন্তু ফলের খোসাটি হারিয়ে গেছে। সনাতনী ভারত ঈশ্বর রামচন্দ্রকে সিংহাসনে বসিয়ে, জীবন্ত রাজপুত্র রামকে বনেই পাঠিয়ে দিয়েছেন। এই হারিয়ে ফেলা মূল চিত্রমালা থেকে আমরা নিতান্ত জাগতিক অর্থাৎ খাদ্য ও পানীয়ের কথা সংক্ষেপে কিছু বলতে চাই।

ইতিহাসে রামায়ণের আগে ছিল জৈন ও বৌদ্ধযুগ। সে সময় অহিংসার অতি প্রবল প্রচার সত্ত্বেও রামায়ণের সমাজে কিন্তু কোনো নিষেধাজ্ঞা ছিল না। অন্নের নাম করেই আমাদের খাদ্য প্রসঙ্গ শুরু হোক। সে যুগে সর্বস্তরের মানুষের প্রধান খাদ্য ছিল যব আর ধান—ব্যাকরণে যা নিয়ে ব্রীহিযবম্ আর বহুব্রীহি। দশরথ রাজার রাজধানী অযোধ্যার মানুষেরা খেতেন সর্বোৎকৃষ্ট শালিধানের চাল। চাল থেকে 'ভক্ত' আর 'ওদন'—অর্থাৎ সেদ্ধভাত। 'কৃশর'—চালের সঙ্গে তিল বা কলাই মিশিয়ে খিচুড়ি জাতের। 'শষ্কুলী'—ভাজা চাল ডাল তিল গুড় সব মিশিয়ে বড় পিঠে। 'মোদক'—মোয়া বা লাড্ডু। 'লাজ'—ধান ভেজে খই। যব থেকে যবসেদ্ধ যা দিয়ে বৈদিক যুগে পুরোডাশ আর পরের যুগের ভালো পিঠে, যার নাম 'অপূপ'। তিল থেকে মোদক—এ যুগে তিলকুট। গুড় আর যবের ছাতু গুলেই সম্ভবত 'গুড়ধানা' আর 'যবধানা' ('সিদ্ধান্ত কৌমুদী'—কারক প্রকরণ দ্র.)। 'যবাগূ' আর 'যবাক'—যবের সরবত গোছের। যবাগূ শব্দটির সঙ্গে বাঙালি পাঠকের পরিচয়—নানা অনুষঙ্গে জড়িত। বিভূতিভূষণের "মেঘমল্লার" গল্পে তান্ত্রিক গুণাঢ্যের মন্ত্র একবার দেবী সরস্বতীকে বন্দী করেছিল। অর্ধমলিন বসনে যবাগূর ঘট নিয়ে দেবী যখন পাহাড় বেয়ে নামছিলেন, প্রদ্যুম্ন চেয়ে চেয়ে দেখছিল, সে ছবি তো ভোলবার নয়। তারপর আসা যাক 'সংযাবে'—সেটি ছাতু,

মাখন আর গুড়ের পিঠে। 'সক্তু'—ভাজা ছোলা কিংবা ছোলার ডাল থেকে তৈরি। আজ পর্যন্ত উত্তর ভারতের দরিদ্র মানুষের এটি প্রধান খাদ্য সামগ্রী। পতঞ্জলির ভাষ্যেও সক্তুর উল্লেখ আছে। প্রসঙ্গত কুষাণ যুগের (সেটিও রামায়ণের যুগ) কথাও বলা চলে। সম্রাট হুবিষ্ক তাঁর পুণ্যশালায় বুভুক্ষিত আর পিপাসিতের জন্যে নুন ছাতু, টক্ ছাতু আর সবজির সঙ্গে ছাতু বিতরণের ব্যবস্থা করেন (দ্র. মথুরা শিলালিপি, খ্রীঃ অঃ ১০৬)। পশ্চিম বাঙলার পুরনো বাড়িতে যবের ছাতু, দুধ গুড় আর একটু দই মিশিয়ে গৃহদেবতাকে নিবেদন করে চৈত্র-সংক্রান্তির দিনে (কোথাও বা অক্ষয় তৃতীয়া তিথিতে) খাওয়ার রীতি এখনও আছে।

আদ্যিকাল থেকে এই সেদিন পর্যন্ত আমাদের ভালো থাকা মানেই ছিল 'দুধে ভাতে' থাকা। দুধ থেকে যে দেবভোগ্য পঞ্চামৃত পাওয়া যেত তা হল ক্ষীর, পায়েস, দই, মাখন আর ঘি। দুধ জাল দিয়ে ক্ষীর, তা থেকে নাড়ু। ঘিয়ের নাম ঘৃত ছাড়া 'আজ্য', 'হবিঃ' আর 'সর্পিঃ'। এ ছাড়া কালিদাস সদ্যোঘৃতের একটি নাম দিয়েছেন: 'হৈয়ঙ্গবীন', সেটি কিন্তু রামায়ণে নেই। 'আয়ুর্বৈ ঘৃতম্' ঘি হল গিয়ে সাক্ষাৎ পরমায়ু, অতি পবিত্র বস্তু, তাই অশুচি অবস্থায় কি এঁটো মুখে ঘিয়ের ভাঁড় ছুঁতে নেই।

বাল্মীকি রামায়ণে তো বালক রামের তেমন ছবি নেই। বৃন্দাবনের গোয়ালার ঘরের ননীচোরা গোপালের ছবি রাজবাড়িতে কি করেই বা পাওয়া যাবে? উৎসবের দিনে ঘরে ঘরে 'ঘৃত কুল্যা', 'দধি কুল্যা' বা ঘি দইয়ের নদী বয়ে যেত। দুগ্ধ দধি এবং 'পায়সকর্দম' শব্দগুলি পাওয়া যায়। সামান্য সরু আলোচাল দুধে ফুটিয়ে একটু গাওয়া ঘি দিয়ে নামালেই পরমান্ন বা পায়েস তৈরি হতো। দেবতা থেকে ঋষি, রাজা থেকে গৃহস্থ সকলেরই এটি প্রিয়। পত্নীকে যেমন সমাদর জানাতে হয়, পায়েসের পাত্রকেও তেমনি সযত্নে ধারণ করতে হয়—পায়েস-লোলুপ কোনো মুনির উক্তিটি বাল্মীকি তাঁর বালকাণ্ডে অবিকল তুলে দিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে মনে পড়া স্বাভাবিক যে গোপকন্যা সুজাতার হাতে পায়েস খেয়েই তো বুদ্ধ তাঁর উপবাস ভঙ্গ করেছিলেন। পায়েসের পাত্র নিয়ে বুদ্ধ ও সুজাতার সুন্দর ছবি আছে অমরাবতী ভাস্কর্যে। পায়েসও অতি পবিত্র বস্তু তাই অনেকে কৃষ্ণপক্ষে এবং রাত্রে সেটি খান না। দেবসেবায়, শুভ উৎসবে আর জন্মতিথিতে পায়েস না হলে এখনও চলে না। ভরত মুনি তাঁর 'নাট্যশাস্ত্রে' রঙ্গপূজার সময়ে দেবী সরস্বতীকে পায়েস উৎসর্গ করতে বলেছেন।

দধি বা দই হল সদা শুচি। আয়ুর্বেদ সংহিতা তো দধি প্রশংসায় ভরা। যাত্রাকালে আর বিদ্যারম্ভে দই খেতে এবং দইয়ের ফোঁটা পরতে হতো। এমনকী বাদশা জাহাঙ্গীর পর্যন্ত অন্তত একবার দইয়ের ফোঁটা পরেছিলেন বলে শুনেছি। দধিলোলুপ কোনো কবি একবার প্রার্থনা করেছিলেন—জন্মে জন্মে তিনি যেন কালিদাসের কবিতা পড়তে এবং 'মাহিষং দধি', মোষের দুধের দই খেতে পান। হিন্দুস্থানী এবং মাড়োয়ারিরা এই পবিত্রতম বস্তুটি এখনও রাত্রে খান না। কৃত্তিবাসী রামায়ণে আছে—দশরথ রাজার শব্দভেদী বাণে মুনিপুত্র মারা গেলেন। মৃত পুত্রকে কোলে নিয়ে অন্ধমুনি বলছেন—

গুরুনিন্দা নাহি করি নাহি সন্ধ্যা বাদ,
দধির সহিত রাত্রে নাহি খাই ভাত।

কোন পাপে তবে আমার পুত্রের এই অকাল মরণ!

দই থেকে তৈরি হতো বিভিন্ন প্রকারের ঘোল। তাদের মধ্যে কোনোটা সাদা, কোনোটা ঈষৎ হলদে, কোনোটা রঙিন। তাদের নাম তক্র, কপিত্থ, রসালা এবং শিখরিণী (রামায়ণের তিলক টীকা সর্বত্র দ্রষ্টব্য)। কোনোটায় জল খুব কম—'নির্জলম্', কোনোটা বা স্বজলবতী। নুন, মিষ্টি, আদা, জিরে, শুঁট, পিপুল, মরিচ, এলাপত্র, আমলকী চূর্ণ মিশিয়ে, ফলের রস বা ফুলের গন্ধ দিয়ে ও রুচি-মাফিক খাওয়ার নির্দেশ ছিল। দইয়ের মাঠা ফেলে প্রচুর জল দিয়ে যে ঠাণ্ডা এবং পাতলা ঘোল, তাকে বলা হতো 'মথিত'। ভাষ্যকার পতঞ্জলি বলেছেন—বাহ্লীক দেশে এই 'মথিত' রাস্তায় ফিরি করে বিক্রি হতো (সম্ভবত গরীবের জন্যে), বৈষ্ণব কবি রসখানের এই পদটিতে 'মথিতের' কথা আছে। (প্রবাদ আছে কবি ছিলেন লোদি বংশের রাজপুত্র)। বৃন্দাবনে যমুনা পেরিয়ে দাউজীর মন্দির, (যেখানে আজও সব ঢুলীরাই মুসলমান) সেখানে 'রসখান' একদা নিত্য পঠিত হতো বলে জানতুম। সে মন্দিরে বৃদ্ধ গায়ক বালমুকুন্দ্‌জীর অতি প্রিয় রসখানের এই গানটি—আশা করি অনেকে শুনেছেন: 'যোগী তপস্বী মুনি ঋষিরা যুগ যুগ ধ্যান করেও যাঁকে পান না, সেই সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণকে, গোয়ালাদের এক ছুকরি নারকোলের মালায় মাঠা তোলা ঘোল খাইয়ে কী নাচই না নাচিয়েছিল!' 'এক আহীর কী ছোহরিয়া ছাছিয়াভর ছাছ পৈ নাচ নাচাওত' (ছাছিয়া=নারকোল মালা, ছাছ=ঘোল)।

ঘোল ছাড়া আরও সরবৎ ছিল। অনেকেই ডালিম এবং আঙুরের রসে সামান্য মধু মিশিয়ে খেতেন। যৎসামান্য হিং বা মরিচ ফোড়নও কোনো কোনো

রসে চলত। ফলের রস বেশি দিন রেখে দেবার জন্যে একটু জ্বাল দিয়ে যা হতো তার নাম 'রাগ' আর ঘন করে জ্বাল দিয়ে হতো—'খাণ্ডব'।

ফল খেতে সবাই ভালোবাসতেন। বেল, কদ্‌বেল, আমলকী, আঙুর, ডালিম, নারকোল, কলা, কুল, আম, কাঁঠাল ছাড়াও কিছু অচেনা ফলেরও নাম পাওয়া যায়। তবে এত ফল মশলার মধ্যে কিন্তু পান সুপারি নেই। সুতরাং দেবী কৌশল্যা বা কৈকেয়ীর তাম্বুল-করঙ্ক-বাহিনী ছিল না এবং সীতাদেবীরও নিশ্চয়ই পানের বাটা ছিল না।

যে মাছ আমাদের বাঙালিদের প্রাণ, রামায়ণে তার উল্লেখ অতি সামান্য। বলার মতো প্রসঙ্গ বোধ হয় একটিই—সেটি অরণ্যকাণ্ডে। সেখানে দৈত্য কবন্ধ রামচন্দ্রের হাতে প্রাণ দিয়ে স্বর্গে যেতে যেতে বলে যাচ্ছেন—'লক্ষ্মণকে পাঠিয়ে দিন পম্পা সরোবরে। ওখানে জলে বড় বড় কাঁটাওয়ালা মাছ, বিস্তর রুইও আছে। চোখা চোখা বাণ মেরে ধরার পর, আঁশ আর পাখ্‌না ছাড়িয়ে, সিকে গেঁথে পুড়িয়ে সেগুলো খেতে হয়।' মৃত্যুর একটু পরেই যিনি স্থিরভাবে—মাছ-ভর্তি দীঘি, মাছ ধরা, পুড়িয়ে খাওয়া ইত্যাদি বাতলে দিতে পারেন তিনি নিঃসন্দেহে নমস্য ব্যক্তি। কবন্ধ হয়ত দণ্ডকারণ্যের আদিবাসী ছিলেন। আন্দামান দ্বীপের বাসিন্দেরা তীর ছুঁড়ে মাছ ধরেন বলে শোনা আছে।

রামায়ণে মাছের উল্লেখ যেমন সামান্য, মাংসের কথা তেমনই প্রচুর। সব কথা না বলে দুটি-চারটি দৃষ্টান্ত দিলেই বক্তব্য স্পষ্ট হবে। অযোধ্যাকাণ্ডে আছে সীতা বনবাসে যাবার পথে গঙ্গাতীরে এসে মা গঙ্গার কাছে মানত করেছিলেন যে মাংস ভাত এবং সহস্রঘট সুরা দিয়ে ফেরবার সময় দেবীকে পুজো দেবেন। এখানে লক্ষ করবার বিষয় এই যে—সীতা সেখানে রাজপুত্রবধূ মাত্র, কিন্তু গঙ্গা এমনই জাগ্রত দেবী, যাঁর কাছে মানসিক করলেই ফল পাওয়া যায়।

এই অযোধ্যাকাণ্ডেই আছে ভরত যখন চিত্রকূটে যাচ্ছেন তখন ভরদ্বাজমুনি তাঁকে আপ্যায়ন করে সৈন্যদের এক বিরাট ভোজ দেন। সেখানে সুরূপা নারী, উত্তম সুরা এবং অসংখ্য পশু ও পাখির মাংসের ব্যবস্থা ছিল। ছাগল, ভেড়া, শুয়োর, হরিণ, ময়ূর, মুরগী, তিতির তো বটেই, তা ছাড়া বহু অচেনা পশুপাখির উল্লেখও পাওয়া যায়। সেখানে সুবর্ণময় অন্নপাত্রগুলি ছিল মাল্যবান ও পুষ্পধ্বজ-বান অর্থাৎ থালার অন্নটি ছিল ফুলের মালায় বেড় দেওয়া আর কোনো কোনো পাত্রে অন্নের মধ্যে নানারকম ফুল গুঁজে দেওয়া হয়েছিল ছোট ছোট পতাকা দিয়ে। সৈন্যদের জন্য সমস্ত পানীয় জল ভরদ্বাজের যোগবলে হয়ে গেল অতি

শীতল আর ইক্ষুরসতুল্য (যাঁরা শীতের ভোরে উত্তর বিহারে আখের রস খেয়েছেন শুধু তাঁরাই এর সোয়াদ বুঝবেন)। কোথায় তুলসীদাসের 'ভরতমিলাপ' যা শুনলে গ্রামের লক্ষ লক্ষ মানুষ আজও কাঁদে, আর কোথায়—নাচে-গানে, সুরা আর নারীকে নিয়ে সৈন্যদের এই প্রমত্ত উৎসব। বানর-রাজ সুগ্রীবের পিতার একটি সুসজ্জিত ও সংরক্ষিত 'মধুবন' বা পানভূমি ছিল। হনুমান যখন সীতা জীবিত এই শুভ বার্তা নিয়ে এলেন, তখন সুগ্রীব এবং অঙ্গদ প্রসন্ন হয়ে পুরস্কার স্বরূপ সমস্ত বানর সৈন্যকে মধুবনে যথেচ্ছ বিহারের অনুমতি দিলেন। ফলে বানর সৈন্যেরা প্রচুর পান করে হেসে কেঁদে, নেচে কুঁদে বেজায় চেঁচামেচি ও মাতামাতি করেছিল। মাতুল দধিমুখকে (রক্ষক) অগ্রাহ্য করে তারা সুন্দর ও সজ্জিত 'মধুবন' তোলপাড় করে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে ফেলে। কৃত্তিবাসী রামায়ণেও এই প্রসঙ্গটি বিশেষভাবে বর্ণিত হয়েছে। রামায়ণে সুরাপানের উল্লেখ সর্বত্র। কিন্তু পানজনিত বিধ্বংসী উন্মত্ততা বোধ হয় এই একটিই।

বাল্মীকি একবার বলেছিলেন—রামচন্দ্র প্রসাধনের সময় বুকে যে চন্দন মাখতেন তার রঙ শুয়োরের রক্তের মতো লাল এবং উজ্জ্বল আভাযুক্ত। কাণ্ড দেখুন, মুনি বলেই এমন একটি উপমান অক্লেশে ব্যবহার করেছিলেন যা শুনে আজও সাধারণে শিউরে ওঠে। এখনও কোনো বৈষ্ণব (বাঙালিদের বাদ দিচ্ছি) মন্দিরে রক্তচন্দন ব্যবহার হয় না। 'রক্ত' শব্দের উচ্চারণ পর্যন্ত নিষিদ্ধ। নিম্বার্ক সম্প্রদায়ে গৃহস্থ মহিলারা শুধু নিজের বিয়ের দিন ছাড়া, অন্য কোনোদিন রক্তবস্ত্র (বেনারসী হলেও) পরতে পান না। 'রক্ত' শব্দটিই অশুচি।

রামায়ণের পঞ্চম অর্থাৎ 'সুন্দর'-কাণ্ডে (যেখানে হনুমান 'সুন্দর' বার্তা এনেছিলেন) রাবণ রাজার মহানস কোষ্ঠাগার (ভাঁড়ার) পান ও ভোজনশালার একটি অসাধারণ বর্ণনা আছে যা পড়লে বৈষ্ণব কবির ভাষায় 'এমন মেনে দেখি নাই' বলা ছাড়া উপায় থাকে না। রাজবাড়ির রান্না ভাঁড়ার খাবার জায়গা সবই বেশ কাছাকাছি ছিল বলে মনে হয়, কারণ বর্ণনাগুলি সব পাশাপাশি। হনুমান যখন গোটা লঙ্কাপুরী তন্ন তন্ন করে খুঁজেও সীতাকে পেলেন না, তখন মরিয়া হয়ে রান্না ভাঁড়ারেই চলে যান; সেখানে তাঁর প্রথমেই চোখে পড়ল রাশি রাশি মাংস, কিছু কাঁচা, সিকে গাঁথা, কিছু নুন দই ও মশলা মাখানো। অনেক পশুপাখির মাংস ছাড়ানো ও সাজানো ছিল—যেমন মোষ, গণ্ডার, হরিণ, শুয়োর, ময়ূর আর তিতির। কি করে হনুমান মাংসগুলো চিনলেন—জানিনে, সেখানে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সোনার থালায় ময়ূর আর মুরগির মাংস আধ-খাওয়া পড়েছিল। সরবৎ

আর ফলের রস পাত্রে সারি সারি সাজানো ছিল। ফলগুলোর কিছু ঠোকরানো, কামড়ানো এবং থেতলানোও ছিল। এক জায়গায় রাশি রাশি ফলের খোসা। কোথাও নিপুণভাবে গাঁথা, দুলছে কিছু, মাটিতে লুটোচ্ছে, কিছু ছেঁড়া আর চটকানো। জায়গাটার কোথাও ফলের ফুলের বা চন্দনের গন্ধ—কোনো জায়গা পুরোই মদের গন্ধে ভুরভুর করছে। রাশি রাশি সোনার সুরাকুম্ভ কতকগুলো ভরা, আধভরা, কতকগুলি খালি—গড়াগড়ি যাচ্ছিল। সুরাপাত্রগুলি স্ফটিকের রত্নের আর সোনার গড়ন বিচিত্র: চারিদিকে রত্নহার মণিমুকুর ছড়ানো, চৌকিগুলো এদিক-সেদিক টানা, অনেকগুলোই ওলটানো। কিছু সাজানো ছিল না অথচ সবই সজ্জিত, সজ্জিত, অতি সজ্জিত। আগুন ছিল না—অথচ পানভূমি যেন জ্বলন্ত অগ্নিময়। অজস্র স্থির আর স্তম্ভিত চিত্র নিয়ে সুন্দরকাণ্ডের সুন্দরতম এই আলেখ্যশালা। লক্ষ করবার বিষয় এই যে রাবণের রান্নাঘরে—ডিম, পেঁয়াজ, রসুনের নাম পাচ্ছি না। মাছ গেল কোথায়? গণ্ডারের কথা আছে—গোমাংসের উল্লেখ নেই। সুরভিত সুরার উল্লেখ সংখ্যাতীত—লঙ্কাপুরীতে আসব, মাধ্বীক, মৈরেয়ক, পুষ্পাসব, ফলাসব এবং সহস্র সহস্র সুরাকুম্ভ ছিল, সে তো থাকবেই। ভরদ্বাজ মুনির যোগবলে স্বর্গ থেকে অগণিত সুরাকলস নেমে এসেছিল। সীতার মানসিক ঘট সহস্রসুরার কথা তো আগেই বলেছি। কেকয় দেশ থেকে ফিরে কুমার ভরত বিস্মিত হয়ে গেলেন—অযোধ্যার বাতাসে পুষ্পগন্ধ এবং সুরাগন্ধ নেই দেখে, ভাবলেন এ কী রকম রাজধানী! রাম যে বনে গেছেন, তা তাঁর তখনও জানা ছিল না।

মেঘদূতে আছে সরস্বতীর জল এমনই সুপেয় ছিল যে স্বয়ং বলরাম সুরাপাত্র (যাতে সর্বদা ভাসত তাঁর পত্নীর চোখের ছায়া) ফেলে আগ্রহ ভরে পরম আদরে সেই জল পান করতেন। প্রাচীন ভারতের বীর্যবান এবং আনন্দিত মানুষের স্বাক্ষর মেঘদূতের শ্লোকে শ্লোকে। এখানেও তাই, এখানেও সুরা 'রেবতীলোচনা' এবং জল ইক্ষুমধুর।

কাঁঠাল-চরিত্র

আষাঢ় মাস আসতে আর বেশি দেরি নেই। তা, হঠাৎ মনে পড়ল যেন কত যুগ কাঁঠাল খাইনি। পাড়ার পুরোহিত এক মুখুয্যে মশাই সেই বর্ধমান থেকে তাঁদের বাগানের গোটাকতক কাঁঠাল কোয়া আর যথাকালে তালের ফুলুরি খাইয়ে আমার দুঃখমোচন করতেন, তা তিনিও কতদিন নেই। এখনকার ছেলেরা কাঁঠাল কিংবা তাল কোনোটাই খায় না। তাল-কাঁঠালের গন্ধ বাজে নয় শুধু, অসহ্য কিংবা বীভৎস, কিংবা দুই-ই। ওরা থাক ওদের পছন্দ নিয়ে— আমি আমার খুশিমতো কাঁঠাল-চরিত্র লিখি।

রাম শ্যাম যদু মধুর মতো এ-দেশে কাঁঠালের আগে যে নামটি সর্বদা উচ্চারিত হয় তা হল আম। রূপে রসে সোয়াদের গড়নে তার জুড়ি দেশে নেই, তাই সে ফলের রাজা। তার ওপর অগুনতি বই ছবি ইতিহাস, তার ফলন দরদাম বাজার নিয়ে সরকারি বেসরকারি হরেকরকম চর্চা। এদিকে কাঁঠাল ওজনে ভারী হলেও কৌলীন্য নেই, তাই ভরসা করছি তার কথা বলতে, কেননা তার পক্ষ নিয়ে কোনো উকিল আসবে না মামলা লড়তে।

সংস্কৃত ভাষায় কাঁঠালের নাম পনস আর কণ্টকী ফল। শুধু বাংলা অসম ওড়িশা নয়—ভারতের প্রায় সর্বত্রই কম বেশি ফলে—এতগুলো ভাষায় তার একটা করে নতুন নামও রয়েছে— তবে সে ঝামেলায় যাব না. এ দেশের কথাই বলি। সবচেয়ে সরেস জাতের ফল হল রস খাজা। তুলনা দেওয়া যায় না, বলা যায়—পনসঃ পনসোপমঃ। রস খাজার পরে হল নেওয়া গোলা বা লোদা। এটাই ফলে বেশি, চিবিয়ে খাওয়া যায় না, নিঙড়নো রসটার নাম মাড়ি, দুধে কিংবা ক্ষীরে মিশিয়ে খাওয়া হয়। নেওয়া কাঠালের রস বের করবার জন্যে শুনেছি অসমে একরকম ধুচুনির ব্যবহার আছে। সেটা এ-দেশে দেখিনি। তারপর হাজারি, খেতে মোটামুটি রকম। একটা গাছে এক-শ' দেড়-শ' ফল বছরে হলে তাকেই হাজারি বলা হয়—স্নানযাত্রায়, রথের মেলায় ফলটা সত্যি হাজারে হাজারে আসে, বিক্রিও হয়। গুঁড়ির গায়ে ছোট ছোট গোল গোল যেটা ফলে, কাঁটাও থাকে ঘন ঘন তাতে, সেটারই নাম রুদ্রাক্ষী। ভেতরে আট-দশটার বেশি কোয়া থাকে না। শেয়ালে নেয় বলে শেয়াল-খাগিও বলা হয়। গরিব ঘরের ঝি-

বউরা রান্নার পাট সেরে এক-একটি আস্ত কাঁঠাল মোচড় দিয়ে পেড়ে পুকুর পাড়ে নিয়ে যেত। গল্পগাছা সেরে খোলাটা ফেলে বিচিগুলি ধুয়ে বাড়ি ফিরত। শেষমেশ বুনো বা বাঁদুরে,— খেতে সুবিধের নয়, টক। পথচলতি মানুষ কুড়িয়ে পেলে গোবিন্দকে উড়ো খই দেবার মতো বটতলায় পড়ে থাকা শিবঠাকুরের মাথায় চড়িয়ে দিয়ে যায়। শিবের পাওনার মধ্যে কাঁটাসুদ্ধু বেলপাতা, বিচিভরা কাঁচাপাকা বেল, জংলি আকন্দ ধুতরো যেমন, এও তেমনি। দিশি নাম ডেলো, লাটিন ভাষায় এর নাম লকুচ, শিবেরও এক নাম লকুচ-পাণি। এই টক বুনো কাঁঠালের এঁচোড়ের রান্নার আর আচারের কথা দীঘাপতিয়ার কিরণলেখা দেবী লিখে গেছেন। একটা কথা আরও বলি, কলকাতার মানুষ আগে সর্বদা 'কাঁটাল' বলতেন, বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্তও তাই। এখন যস্মিন্ দেশে যদাচার; মেনে নিয়ে 'কাঁঠাল' লিখছি বাধ্য হয়ে।

তা ফলটা খায়নি কে তা তো জানিনে। স্বয়ং মহাপ্রভু আদর করে খেতেন। পুরীতে রাজা প্রতাপরুদ্র প্রভুকে আম নারকোল আর কাঁঠাল খাইয়েছেন। সন্ন্যাস নেবার পরে নবদ্বীপে এসে শচীমায়ের বাড়িতে যেদিন খেলেন মধ্যলীলায় তার বর্ণনা আছে। দূর দূর গাঁয়ে লোক পাঠিয়ে যার গাছে যেটি ভালো ফলে সেইসব আম-কাঁঠাল তাঁর জন্যে আনানো হয়েছিল। সেকালে ওড়িশায় গৃহস্থেরা আলাদা প্রণামী দিয়ে সুয়ারো বা সুপকারদের তৈরি 'পনস পনা' বা কাঁঠালের সরবৎ প্রভুকে আগে নিবেদন করে তবে নিজেরা কাঁঠাল খেতে শুরু করতেন। তাঁদের 'পনস বাগিচা'র ভালো ফল প্রভুর নামে চিহ্নিত থাকত। অসমে-ওড়িশায়, গোটা পূর্ববঙ্গে কাঁঠালের আদর খুব বেশি। অসমে ঘরে যখন 'নাম-ঘোষা' বা কীর্তন হয় আগে থেকে ক্ষীর-কাঁঠাল বাটি ভরে দাওয়ায় থাকে— কীর্তনের শেষে গোঁসাইরা খাবেন বলে। কবিকর্ণপূর এঁচোড়ের দু'তিনরকম তরকারির কথা লিখে গেছেন, এগুলো শ্রীকৃষ্ণকে দিনের ভোগে নিবেদন করা হতো। একটা কাসুন্দি আদাবাটা নারকোল বাটার সঙ্গে কাঁঠাল বিচি দিয়ে, অন্যটা ছোলার বড়া বা ধোঁকা, তাতে হিঙ আর মরিচ দিয়ে ডালনা। বইয়ের নাম 'শ্রীকৃষ্ণাহ্নিক কৌমুদী।' বিমানবিহারী মজুমদার আমাদের জন্যে সরল বাংলায় লিখে গেছেন। আসল কথা এই যে, এঁচোড় কাঁঠালের নিন্দে তারাই করে—যারা খায়নি বা খেতে জানে না।

হাতে হাতে প্রমাণ দেখুন কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে। কালকেতুর রাক্ষুসে খাওয়ার কথা মনে করুন :— মুচড়ে গোঁফদুটো দু'দিকে বেঁধে সে শুধু হাঁড়ি হাঁড়ি

আমানি আর ক্ষুদের যাউ খাচ্ছে, তে-এঁটে তালের মতো এক-একটা ভাতের গরস মুখে তুলছে-- তবু কেন ফুল্লরা তাকে একটা পেল্লায় কাঁঠাল দেয়নি তা জানিনে। ব্যাধের বাড়ি খাদ্যাখাদ্য বিচার ছিল না, এ ছাড়া কী আর বলি। অমন রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র, যাঁর বই কাত্ করে রাখলে রস গড়িয়ে পড়ত, সেই তিনি শুধু 'রসে বুঢ়াইয়া' কাঁঠাল বিচি ভেজেই ছেড়ে দিলেন, নিশ্চয় সেদিন তাঁর মেজাজ খারাপ ছিল। রাজা রামমোহন রায়; যিনি একটা গোটা পাঁঠা খেতে পারতেন, তিনি নিশ্চয় আস্ত কাঁঠালও খেয়েছেন—জীবনীকারেরা এসব তুচ্ছ কথা নিয়ে মাথা ঘামান না, তাই খোঁজ নেননি। ঈশ্বর গুপ্তের লেখায় তো একটা খাবারের দোকান সাজানো, কিন্তু তিনি পাঁটা, আণ্ডাওয়ালা তপ্সে মাছ আর আনারস লিখে ক্লান্ত হলেন কেন? কোনোরকমে ঢেরা সই দিয়ে একটি ছত্তরে স্নানযাত্রা ফেরত মেয়েদের ছবি দিয়েই থেমে গেলেন--'আসে বাড়ি যত রাঁড়ি হাতে পাখা মাথায় কাঁটাল'। আহা! গরিব বিধবার জন্যেই যেন কাঁঠালের সৃষ্টি, দু'ক্রোশ পথ ভেঙে হালকা তালপাখা আর মস্ত কাঁঠাল নিয়ে হেঁটে হেঁটে তারা ফেরে। আরও দুটি ছত্তর পদ্যে পাই এই মেয়েদের উচ্ছ্বাস—'নির্ধনের ধনমাণিক্য কাঁঠালের বড়ি। প্রাণ চায় কাঁসিসুদ্ধ ঝোলের মধ্যে পড়ি।' বড়ি অর্থাৎ বিচি, মেয়েদের বড় আদরের জিনিস। পুরনো সেই ছড়াটা বলি—বউ নিবন্ত উনুনে বিচি পোড়াতে দিয়েছেন, চেনা শব্দ, তাই শাশুড়ি বলছেন, 'ফুট করল কি? বউ—কাঠাল বিচিটি। শাশুড়ি—দে না বউ খাই। বউ—পুড়ে হল ছাই।' দিন চলে গেলে এমন দশাই আসে বটে।

নৈহাটির কাঁটালপাড়া থেকে গজা রসমুণ্ডি জিলিপি আনবার ফরমাস বিদ্যাসাগর মশাই হরপ্রসাদ শাস্ত্রীকে করেছিলেন। আমরা জানি রাধাবল্লভের বিখ্যাত মেলায় এখনো ওখানে শ'য়ে শ'য়ে কাঁঠাল বিক্রি হয়। কমলাকান্ত চক্রবর্তী বলেন, 'মনুষ্য জাতিমধ্যে এক্ষণকার বড়মানুষদিগকে কাঁটাল বলিয়া বোধ হয়।...কাঁটাল ভাঙিয়া উত্তম নির্জল দুগ্ধের ক্ষীর করিয়া কামলাকান্তের ন্যায় সুব্রাহ্মণকে ভোজন করানোই ভাল।'

কাঁঠালের কথা বঙ্কিম 'আনন্দমঠে'ও এনেচেন। কল্যাণীর মেয়েকে কুড়িয়ে নিয়ে বোন নিমাইমণির বাড়ি গিয়ে ভরপেট ভাত খেয়ে, একটা নয় দুটো পাকা কাঁঠাল খেলেন। দীনবন্ধু মিত্তির কাঁঠাল-কোয়ার সঙ্গে ভালোবাসাকে এক আসনে বসিয়েচেন, 'পিরিতি তুল্য কাঁঠাল কোষ / বিচ্ছেদ আটা লেগেচে দোষ॥' বোধ হয় খুব পেটুক ছিলেন। খুঁজতে খুঁজতে রবীন্দ্রনাথের সপরিবারে, সাদরে কাঁঠাল-

ভক্ষণের কাহিনী পেয়ে গেলুম। রবীন্দ্রনাথ মৃণালিনী দেবীকে নিয়ে যখন শিলাইদহে বোটে থাকতেন তখনকার কথা। সেখানে কদম শেখ নামে তাঁদের এক সম্পন্ন প্রজার বিখ্যাত কাঁঠাল বাগান ছিল। আর সে প্রত্যহ একটি করে উৎকৃষ্ট কাঁঠাল জমিদারকে ভেট হিসেবে পাঠিয়ে দিত। এদিকে তাঁদের খানসামা ফটিক রোজ চার আনা করে বিল করে তাতে মৃণালিনী দেবীর সই করিয়ে দাম নিত, যা কদম জানত না। রবীন্দ্রনাথ কাঁঠালের ভক্ত ছিলেন। মৃণালিনী বলে দিতেন—'পুণ্যাহ পর্যন্ত আমরা আছি, কদার (কদমের ডাক নাম) কাঁঠাল রোজ আমাদের চাই।' এদিকে ফটিক অসুস্থ হওয়ায় নতুন খানসামা যেই কদমকে পয়সা দিতে গেছে অমনি ফটিকের চুরি ধরা পড়ল। কদম বললে, আমি হুজুর সেবা করবেন বলে ফল পাঠাই, বেচতে যাব কেন? সে দরখাস্ত লিখে সব কথা জানাল আর কদা নামের বদলে সকলে যেন তাকে কদম বলেই ডাকে এও প্রার্থনা করল, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাকে আদর করে কদা বলেই ডাকতেন। কাহিনীটি চমৎকার, শিলাইদহের বাসিন্দা শচীন্দ্রনাথ অধিকারীর কল্যাণে পাওয়া।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সদাশিবের তিনকাণ্ডে' রয়েছে মহারাষ্ট্রবীর সদাশিব তাঁর নায়িকাকে নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে পালিয়ে যাচ্ছেন। একটা কাঁঠাল তাঁদের দুজনকার পথের খাদ্য। কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের "খেমী" গল্পটি সুন্দর, খেমীর বাবা কাজকর্ম ছেড়ে কাঁঠাল খাবার জন্যে শ্বশুরবাড়িতে ঘরজামাই হয়ে রয়ে গেলেন।

কেদারনাথ বাঁড়ুয্যেকে ধরে বসলে কাঁঠাল খাবার দু'চারটে দক্ষিণেশ্বরী গল্প তখুনি শুনিয়ে দিতেন। আপাতত তাঁর "ভগবতীর পলায়ন" গল্পে পেলুম দিগ্বিজয়কে, যে পুজোর দিনে অসময়ের কাঁঠাল জোগাড় করে দিয়ে বাহাদুরি নিত। বিভূতিভূষণ "তালনবমী"র মতো অত সুন্দর গল্প লিখলেন কিন্তু 'শয়নে কাঁঠাল' গোছের একটাও লিখলেন না কেন? শয়ন একাদশীতে কাঁঠাল খাবার লোভ তখন গরিব ব্রাহ্মণের খুবই থাকত। আষাঢ়ের একাদশী থেকে কার্তিকের একাদশী পর্যন্ত শ্রীহরি শুয়ে থাকেন—এই হল চাতুর্মাস্য। এর মধ্যে শয়ন উত্থান পাশমোড়া, একাদশীতে ব্রত করে দ্বাদশীতে ব্রাহ্মণ-ভোজন করানো অবশ্যকর্তব্য। আষাঢ়েই তো কাঁঠালের আদৎ সময়—কবে শুক্লা দ্বাদশী আসবে, জমিদার-গিন্নী ক্ষীর-কাঁঠাল খাওয়াবেন, এটা ছিল ঔদরিক ব্রাহ্মণের সুখস্বপ্নবিশেষ। বাড়িতে একবার সম্বলপুর থেকে এক ঝুড়ি উৎকৃষ্ট আতা আসার পরে দেখা গেল বাড়ির দুই বৈষ্ণব জামাই বহুবীজ ফল চাতুর্মাস্যে খাবেন না, অর্থাৎ আতা তাঁদের চলবে না। শাশুড়িরা প্রায় শোকার্ত, তাই রকম দেখে পিসিমা বিধান দিলেন, 'আহা,

আত্মাকে কষ্ট দিতে নেই, বিশেষ, যখন ইচ্ছে রয়েছে। একে ব্যাটাছেলে তায় জামাই, ওরা খাবে বৈকি, তবে দু'কুড়ি অন্তত কাঁঠাল বিচি যেন বিধবাদের দেয়, তা হলেই মূল্য ধরে দেওয়া হবে, দোষ কেটে যাবে।'

পিসিমার উক্ত বিপত্তারিণী হিতকথার সঙ্গে দীনেন্দ্রকুমার রায়ের একটি ব্যঙ্গ রচনা বা নকশার ভাবে আশ্চর্য মিল আছে, সেটি এইরকম—এক গুরুদেব নামাবলী গায়ে পাঁজি-পুঁথি নিয়ে বার্ষিক আদায় করতে শিষ্যবাড়ি গেছেন। শিষ্য জেলে, না চাইতে গুরুকে পেয়ে যেন হাতে স্বর্গ পেল। তারপর জাল কাঁধে বেরিয়েই পুকুরে গিয়ে গুরুকৃপায় মস্ত রুই মাছ একটা পেয়ে গেল। মাছ দেখে জেলে-বৌ যখন আহ্লাদে আটখানা, তখন হঠাৎ গুরু বলে বসলেন, রবিবারে তিনি মাছ খাবেন না। জেলে-বৌ কাঁদতে লাগল। জেলেও বিস্তর কাকুতিমিনতি করে বললে, এ মাছ বেচব না প্রভু, আপনার নামের গুণে পাওয়া, আপনি শাস্তর ঘেঁটে বিধান দিন যাতে আমরা পেসাদ পাই। নিরুপায় গুরু শিষ্যের জন্য শাস্ত্র ঘেঁটে বললেন,—যা, ওই ঝোলে পাঁচ-দশটা কাঁঠাল বিচি ফেলে দে—কাঁঠাল বিচি আমিষের দোষ কাটায়। গল্পটি পুরনো, তবে দীনেন্দ্রকুমারের রচনায় সাহিত্যগুণের সঙ্গে বিচি-মাহাত্ম্যও জ্বলজ্বল করছে।

কাঁঠাল না পেয়ে কাতর হয়েছিলেন সুকুমার সেন মশাই। চোদ্দ পুরুষে তাঁরা বর্ধমানে গোতানের জমিদার। তাঁর পিতামহ বিস্তর চেষ্টা করেও কাঁঠাল বা নারকোল কিছুই ফলাতে পারেননি। অথচ বর্ধমানের অকালপৌষ গ্রামের গরিব পুরুতঠাকুর তাল নারকোল কাঁঠাল সবই শুকনো ডাঙায় ফলিয়ে এবং বিলিয়ে গেলেন। মজা মন্দ নয়। দীনেন্দ্রকুমার আম-লিচুকে বাদ দিয়ে শুধু কাঁঠালেরই ভক্ত ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর কারণও ওই কাঁঠাল-ভক্তি। বেশি বয়সে অতিরিক্ত কাঁঠাল খেয়ে আর হজম করতে পারেননি। তথ্য পেয়েছি 'বারোমাস' পত্রিকায় অজিত দাসের লেখা থেকে।

কাঁঠালপাতা বেলপাতা আর দুব্বো গুণে গুণে সতেরোটা করে নিয়ে আঁটি বেঁধে মঙ্গলচণ্ডীর ডালায় সাজিয়ে দিতে হয়। রামপদ মুখোপাধ্যায়ের 'শাশ্বত পিপাসা' উপন্যাসে কাঁঠালপাতার নৈবিদ্যির কথা আছে। বর্ধমানের এক জমিদার-গিন্নি ভোরবেলা উঠে কাঁঠালপাতা কুড়োতেন। ছাগল নিয়ে দুধ দিতে এসে গয়লা রোজ ওই কাঁঠালপাতার পোঁটলা নিয়ে যেত—গিন্নি কাকে ভালোবাসতেন, ছাগলকে না কাঁঠালপাতাকে! কিংবা দুটোকেই। দেবানন্দপুর গ্রামে রস খাজা গাছটির নাম পদ্মরাজ, ফলন ছিল কম। দেশে থাকলে দিদিমা মুচি বেরুলেই রোজ

একবার দেখে যেতেন। একবার মুচি ধরেনি তাই রাধাকান্তদেবের কাছে ঘৃত পরমান্ন মানত করেছিলেন। বাঁজা গাছ হলেও কাঠের গুণে গাছ কাটানো হয় না। কাঁঠালের ঘন আঠা এখন আর ওষুধে লাগে না, গ্রামের ছেলেদের পাখি ধরায় এখনো লাগে।

শশিশেখর বসু থাকতেন বেশির ভাগ সময় বিহারে। তিনি ভুট্টা আর লিচু নিয়ে কত না আদিখ্যেতা করেছেন, 'হরি বলতে কতক্ষণ, না চটকে লিচু চিনি কিছু গিলতে যতক্ষণ।' তিনি কাঁঠাল নিয়ে কেন যে আরো কিছু লিখলেন না! বিহারিরা তাদের 'কট্‌হলে'র খুবই ভক্ত। কাঁঠাল বিচি জাঁতায় পিষে ছাতু করে আটা-ময়দায় মিশিয়ে তারা রুটিলুচি করে খায়, এমনটা উত্তর আর মধ্যপ্রদেশেও হয়। 'পাকপ্রণালী'র লুচিপ্রকরণে একসময়ে কাঁঠালের লুচির কথা ছিল, হালের সংস্করণে হয়ত নেই। এটার চলও পশ্চিম বাংলায় নেই, যদিচ জিনিসটা খুব উপকারী এবং উপাদেয়।

পরশুরামের কেদার চাটুজ্যের অপূর্ব বক্তৃতা জানা থাকলেও আবার শুনুন— 'এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো মশায়। এই ধরুন হিমালয় পর্বত, যার জোড়া দুনিয়ায় নেই। তারপর ধরুন রয়াল বেঙ্গল টাইগার—কে লড়বে তার সঙ্গে? তারপর ধরুন কাঁটাল। ফলের রাজা হচ্ছে কাঁটাল, দু'মন পর্যন্ত ওজন হয়। আবার কাঁটালের রাজা ওতোরপাড়ার রঙ্গুলবাবুদের গাছের রসখাজা। এক একটি কোয়া এক এক পো, কাঁচাসোনার বর্ণ, ভাইটামিনে টইটম্বুর। গালে দিয়ে এদিক ওদিক করে রস অনুভব করুন। কোথায় লাগে আপনাদের কালিয়া কোপ্তা কোর্মা। হেন বস্তু নেই যা কাঁটালে পাবেন না। গুঁড়ি চিরুন—তক্তা হবে, হোগ্‌নি কাঠ তার কাছে তুচ্ছ। পাতা পাকিয়ে নিন—হুঁকোয় পরাবার উত্তম নল হবে। ফলের তো কথাই নেই। কোলে তুলে বাজান—পাখোয়াজের কাজ করবে। কাঁচার কালিয়া খান যেন পাঁঠা। বিচি পুড়িয়ে খান যেন কাবুলি মেওয়া। পাকা কোয়ার রস গ্রহণ করে ছিবড়েটা চরখায় চড়িয়ে সুতো কাটুন বেরোবে সিল্ক।'

একটি দুঃখ মলেও যাবে না যে হাটখোলার যতীন্দ্রমোহন দত্ত, ইদানীং টালার যমদত্ত, কাঁঠাল নিয়ে কিছু লেখেননি। ইলিশ চিংড়ি কৈ চেতল মুড়ি মুড়কি কচু ওল মায় শিলনোড়া নিয়েও তিনি লিখেছেন। কাঁঠাল কি শিলনোড়ার চেয়েও অখাদ্য! অবিশ্যি তাঁর সমস্ত খুচরো লেখা নিশ্চয় আমার চোখে পড়েনি। কবে যে তাঁর সব লেখা একসঙ্গে পাওয়া যাবে!

গিরিবালা দেবীর 'রায়বাড়ি' উপন্যাসে বিনুর ঠাকুমা ক'কুড়ি নারকোলে

হাজার হয় সেই হিসেব নিয়েই সারাদিন ব্যস্ত—কাঁঠালের হিসেব তেমন মন দিয়ে করেননি। প্রসাদের বউ বিনুর নাক খাঁদা, রঙও ধবধবে ফরসা নয়। বউ দেখেই সবাই বলতে লাগলেন শ্বশুর মহেশবাবুকে ভালোমানুষ পেয়ে ধুরন্ধর কুটুমেরা তাঁর মাথায় কাঁঠাল ভেঙেছে, খুব ওস্তাদ তারা। খাঁদানাকী বিনুকে ডেকে প্রসাদের ঠাকুমা বললেন, বুঁচি শোন শোন, 'ইলিশের পচা আর সোঁদরের বোঁচা' এদের সবার কাছেই আদর! একটু একটু পচা বা নরম ইলিশ মাছ ভাজতে গেলে ঝুরঝুরে হয়ে যায়, তাতে কাঁঠাল বিচি দিলে খাসা খেতে হয়। আর সুন্দর মেয়ের নাক একটু ভোঁতা হলেও ভালোই লাগে দেখতে। বিনুর কতটা ভালো লেগেছিল সেই জানে।

দেড়শো বছর ধরে কলকাতা শহরে যত রান্নার বই চালু আছে সবগুলোতেই এঁচোড়ের ডালনা, তরকারি, আচার আর বিচির কথা। 'পাকরাজেশ্বর' বলেছেন পনসে কদলং' অর্থাৎ বেশি কাঁঠাল খেলে শেষে কলা খেলে হজম হয়ে যায়। আমরা জানতুম কাঁঠাল হজমের ওষুধ হচ্ছে শেষপাতে বিচি চিবিয়ে খাওয়া। বিচির পোড়া ভাতে চচ্চড়ি এগুলোই সর্বদা চলে, বিচির আটা বা ছাতু মেখে, নইলে ভেজে একরকম নাড়ুও হয়। কাঁঠাল বিচির একটা সুন্দর নাম ওড়িশায় চলে : 'পনসমঞ্জী', এ নামটা এদেশে এখন চালানোর পক্ষে বড় দেরি হয়ে গেছে। বিপ্রদাস, প্রজ্ঞাসুন্দরী, কিরণলেখা, রেণুকা চৌধুরানী সব মিলিয়ে দেখলুম এঁচোড়ের ডালনা, ঘণ্ট, ধোঁকা, ভাজা, চপ, কারী, কাবাব, কালিয়া কী যে না হয় তার ঠিকঠিকানা নেই! আজকাল দক্ষিণের কেরলে এঁচোড়ের কাঁটাভরা খোসা ছাড়া সবকিছুই খাদ্য হিসেবে চলেছে। 'কিনু গোয়ালার গলি'তে পড়ে থাকা 'কাঁঠালের ভূতি পচা'র আর সেদিন নেই, সেটা দিয়ে জ্যাকফ্রুট পিকল হচ্ছে, কাঁঠালসত্ত্বের নাম জ্যাকফ্রুট লেদার, স্কোয়াস, জ্যাম, জেলি—সে-দেশে অফুরন্ত। কাঁঠালের মুষলোয় পেকটিন থাকে, সেটা লাগে জেলি বসানোর জন্যে। কিরণলেখার ১৩২৮-এর 'বরেন্দ্র রন্ধনে' আনারস কাঁঠালের মুষলো দিয়ে রান্নার কথা আছে।

ডাঃ সরসীলাল সরকারের স্ত্রীর রান্নায় নতুন কিছু করায় ভারি সখ ছিল। তেলেভাজা পান্তুয়া আর ছানার জিলিপির জন্যে নাম ছিল তাঁর। কাঁঠালের আমসত্ত্বও বসাতেন, চার-পাঁচ দিন থাকত। মুর্শিদাবাদের বাগান থেকে তিনি প্রচুর আম কাঁঠাল নিয়ে বাড়ি ফিরতেন। রেল কোম্পানির চেকারেরা তা থেকে ভাগ বসাত। একবার তাঁর দাসী কাঁঠালের মুষলো ধরে আছে, টানাটানিতে

কাঁঠাল ভেঙে প্ল্যাটফরমে পড়ে গেল। ভাগ্যে বিপদ ঘটেনি। আম কাঁঠালের অনেক রকম গল্প তাঁর মুখে শুনেছি। আমাদের এই পাকা কাঁঠালের কিন্তু বিপ্লব আন্দোলনের ইতিহাসে একটা অত্যাশ্চর্য ভূমিকা আছে। ১৯০৮ সালে আলিপুর জেলের ভেতরে রাজসাক্ষী নরেন গোঁসাইকে একজোড়া রিভলভার নিয়ে গুলি করেন চন্দননগরের কানাইলাল দত্ত আর মেদিনীপুরের সত্যেন বসু। ঘটনার কিছুদিন আগে থেকেই আত্মীয়েরা বারেবারে নানারকম খাবার, আম কাঁঠাল এসব পাঠাতে থাকেন। প্রথম প্রথম পরীক্ষা করে দেখলেও সন্দেহের কোনো কারণ না থাকায় শেষে পরীক্ষা করা নিশ্চয় হয়নি। জেলের প্রহরীরা টাকা নিয়ে নেশার জিনিস কাগজ পেন্সিল এসব এনে দিতে পারে, কিন্তু জোড়া রিভলভার তারা কখনই এনে দেবে না। বড় কাঁঠালের ভেতর পাঠানো রিভলভারের কথা উপেন বাঁড়ুয্যে সোজাসুজি স্বীকার না করলেও তাঁর 'নির্বাসিতের আত্মকথা'য় একরকম বলা আছে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে।

কেরল দেশের কফিবাগানে ছায়াবৃক্ষ হিসেবে কাঁঠাল গাছের সর্বত্র আদর। আধুনিক কৃষিবিজ্ঞানীরা বলছেন—কাঁঠালে প্রোটিন, ফ্যাট, কার্বোহাইড্রেট, ক্যালশিয়ম, ফসফরাস, ভিটামিন, মিনারেল সবই আছে। পরশুরামের কেদার চাটুয্যেও বলেছিলেন—কাঁঠালে ভিটামিন এ. বি. সি. ডি থেকে বি এল এ ব্লে, এ স্লাই ফক্স মেট এ হেন—সবরকম পাওয়া যায়। আম কলা কিংবা নারকোলের ওপরেই যখন আলাদা কোনো বাংলা নেই তখন কাঁঠাল নিয়ে ভালো লেখার আশা করাই বোধ হয় অন্যায়। আয়ুর্বেদশাস্ত্রে এর সামান্য রকমের গুণাগুণের কথা বলা হয়েছে।

এমন যে ফল তার কাঠ নিয়ে একটু বলতে ইচ্ছে হচ্ছে। বার্মা সেগুন যখন আর নেই, দিশি কাঁঠালের কাঠই অগত্যা চলুক—আমের চেয়ে কাঁঠালের কাঠ ভালো। আমকাঠে জল সয় না। সে-যুগে ঘরে ঘরে ঠাকুর বসানোর মস্ত জলচৌকি থেকে দেল্‌কো আর লণ্ঠন বসানোর এতটুকু চৌকি, তক্তপোশ, সিন্দুক, আলনা, বাক্স, বারকোশ, নুনের কেটো হাতা, চামচ, ডালের কাঁটা, চাকি বেলুন, খেলনার নৌকো, রথ, সেলাইয়ের বাক্স, সবই হতো। ফিরিস্তি দিতে গিয়ে মনে পড়ল 'পথের পাঁচালী'তে পাই দুর্গার মৃত্যুর কথা না জেনেই হরিহর জিনিসপত্তর বের করতে করতে সর্বজয়াকে বলছে—'তোমাদের জন্যে কাঁঠালের চাকী বেলুন এনিচি।' তখন তার দাম হবে বড়জোর ছ'আনা। বড় বাড়ির খেলনার আলমারিতে দেখেছি—কেষ্টনগরের ফরমাসী মস্ত কাঁঠাল, বার্মার গালা দিয়ে মোড়া কাঁঠাল আর কুমড়ো।

বার্মায় কাঁঠালের ফলন নিশ্চয় ছিল, সিঙ্গাপুর অঞ্চলে যখন খুব ভালো ফলে।

ভাত খাবার পিঁড়ির জন্যে ঘরে ঘরে কাঁঠালের রাজত্ব। ছেলেরা ভাত খাবার পর আপাদমস্তক ধুয়ে সেগুলো শুকতে দেওয়া হতো। মোটা খুরো দেওয়া পালিশ করা জিনিস—আমার বন্ধুর কাকাবাবু তাঁর নিজস্ব পিঁড়িকে বলতেন 'জ্যাকপিড়িং'। জানিনে তাতে তেল মালিশ করা হতো কিনা। ঢাকার মুরাপাড়ার জমিদারেরা তাঁদের কালীমন্দির বাড়িঘর সাজানো বাগান পুকুর হাতি ঘোড়া সব ফেলে কলকাতায় চলে এলেন দেশভাগের পরে। বন্ধুর মুখে শুনেছি—তাঁর ঠাকুমা মধ্যে মধ্যে গাম্ভারী আর কাঁঠাল কাঠের পেল্লায় পিঁড়ির জন্যে খেদ করতেন।

কলকাতার টালার চাটুয্যেরা কাশীর হাড়ারবাগে বাড়ি করেছিলেন। সেখানে আমরা ভাড়া নেবার পর একটা বন্ধ ঘর খুলে দেখি—সেখানে কাঠের রাজত্ব। তক্তপোশ মনে করেছিলুম, দেখি সেটা পিঁড়ির ফ্রেম। পিঁড়িগুলো তাতে খাপে খাপে বসানো। খুলে নিলে ভাত খাওয়া, এঁটে দিলে রাতে শোওয়া দুই চলে। ঝকঝকে তেল পালিশ, চমৎকার চওড়া খুরো বসানো, অমন আর দেখিনি। মণিলাল বাঁড়ুয্যের গল্পটা শুনুন—কোনো বরের বাপের কাছে মেয়ের বাপ এলেন কথা কইতে। বরপক্ষের খাঁই ছিল জেনে সংক্ষেপে বললেন, বেয়াই এমন জিনিস দোব যাতে তিন পুরুষ বসে খাবে। বরপক্ষ তাই শুনে পাকা কথা দিলেন। ওদিকে ফুলশয্যের তত্ত্ব এলো নিতান্ত সাদামাটা। কর্তা শুনলেন আরও জিনিস আসছে। বসে বসে থেকে মেয়ের বাড়ি থেকে শেষে এল দু'জনের মাথায় কাপড়ে মোড়া দু'খানি কী বস্তু। খোলার পর দেখা গেল দু'খানি ভারী কাঁঠাল কাঠের পিঁড়ি, সঙ্গে মেয়ের বাবার চিরকুট। তা তিনপুরুষ বসে খাবে কথাটা তো সত্যি। নিউ থিয়েটার্সের 'সাপুড়ে' সিনেমাতেও 'ঘি মউ মউ আমকাঁঠালের পিঁড়িখানি আন' বলে গানের কী একটা কলি ছিল। কাঁঠাল যেবারে বেশি ফলত দু'তিন পয়সার কাঁঠালে রাত্তিরে দু'জন গরিব মানুষের পেট ভরা খাওয়া হয়ে যেত। সন্ন্যাসিনী স্বরূপানন্দের সেবিকা ননীবালা তাদের এইরকম তাল কাঁঠালের মাড়ি খেয়ে মাসের পর মাস রাত কাটানোর গল্প অনেকবার করেছে। বিচি আর ফল নিয়ে দুটো শোলোক শোনাই—

অস্তি চেৎ পানসং বীজং ব্যঞ্জনৈং কিং প্রয়োজনম্।
নাস্তি চেৎ পানসং বীজং ব্যঞ্জনৈঃ কিং প্রয়োজনম্॥

অর্থাৎ কাঁঠাল বিচি থাকলে অন্য তরকারি চাইনে। আর যদি নাই থাকে তবে কি দিয়ে বা খাব! তারপর আম-কে দেখে দুঃখে অভিমানে কাঁঠালের বুকে

এমন আঘাত এল যা থেকে ঐ শূল বা মুষলের উদ্ভব হল—

সশূলং ধত্তে হৃদয়মভিমানে চ পনসঃ
সমায়াতে কৃতে জগতি ফলরাজে রসময়ে ॥

ভালো আম পাড়বার জন্যে যেমন দড়ির জালতি থাকে, গাছ থেকে আধ মণ এক মণ কাঁঠাল পাড়বার তেমনি দুটো তিনটে ফাঁস থাকে। দড়ির ফাঁসে জড়ানো কাঁঠাল আস্তে আস্তে গাছ থেকে পাড়া হচ্ছে—একটা দেখবার জিনিস। এসব বাজে ছবি অবিশ্যি এখনকার মন থেকে সরে গেছে। কাঁঠাল খাবার পাল্লা দেওয়া হতো জষ্টি-আষাঢ় মাসে। কবি বনফুলের রান্না খেয়ে কুমারেশ ঘোষ একটা পদ্য লেখেন—

মাথা পেতে দিই কাঁঠাল ভাঙবে বলে
গোঁফে তেল দিই গাছেতে কাঁঠাল দেখে
এমন দিনেতে এঁচোড় কালিয়া রেঁধে
দিলে বনফুল—আমরা অবাক চেখে।

ছায়াভরা আম কাঁঠালের বাগান (উড়কি ধানের মুড়কি তো কবেই গেছে) প্রায় সব শেষ। কাঁচড়াপাড়ার পাশে ঘোষপাড়ায়, মুর্শিদাবাদে, মালদায়, দীনেন রায়ের মেহেরপুরে—গাছপালা কোথায় আর! মানুষের নামে আর পদবীতে ঐ নামটার একটু রেশ রয়ে গেছে। কোনো অধ্যাপকের মুখে শুনেছি—তিরিশের দশকে রিপন কলেজে ভালো বাংলা পড়াতেন বিভূতিভূষণ কাঁঠাল।—আদবে কাঁঠালিয়া বা কাঁঠালে গ্রামের নাম থেকে এ পদবী আসাই সম্ভব। নামটা কিছু নয়, আবার অনেক কিছু। সকলের কাছে নয়, কোনো কোনো মানুষের কাছে।

সেখানে গাছের নাম : কাঁঠাল অশ্বত্থ বট জারুল হিজল ;
দেখিব কাঁঠালপাতা ঝরিতেছে ভোরের বাতাসে
বারবার রোদ তার সুচিকণ চুল নিঙ্‌ড়ায় কাঁঠাল জামের বুকে
অজস্র চুলের চুমা হিজলে কাঁঠালে জামে ঝরে অবিরত
এইখানে জাম লিচু কাঁঠালের বন ধনপতি শ্রীমন্তের বেহুলার লহনার ছুঁয়েছে চরণ
যখন মৃত্যুর ঘুমে শুয়ে র'ব—অন্ধকারে নক্ষত্রের নিচে কাঁঠাল গাছের তলে
এই কার্ত্তিকের নবান্নের দেশে
কুয়াশার বুকে ভেসে একদিন আসিব এ কাঁঠালতলায়।

জীবনানন্দ—যিনি বাতাবির মতো সবুজ ঘাসের ঘ্রাণ হরিৎ মদের মতো গেলাসে পান করেছিলেন, কাঁঠালীচাঁপার গন্ধমেদুর কবিতায় তাঁর নিত্য আবির্ভাব।

উজ্জয়িনীর গাঁজা পার্ক

উজ্জয়িনী শহরের শেষে এক অতি বিশাল নির্জন প্রান্তর ছিল। এই বিস্তীর্ণ জীর্ণ উদ্যানের কথা শূদ্রকের 'মৃচ্ছকটিক' নাটকেও আছে। এই মস্ত পোড়ো মাঠের এক কোণে ছিল চোরডাকাতের আড্ডা। নেশাখোর জুয়াড়ি গাঁটকাটারা মধ্যে মধ্যে সেখানে এসে জুটত। বলতে পারো—সেটা ছিল উজ্জয়িনীর গাঁজা পার্ক।

একবার প্রচণ্ড বর্ষার সময় চোরেদের বাজার অতি মন্দ, আয় হচ্ছে না, চুরি-ডাকাতি, ছিনতাই, রাহাজানি সব প্রায় বন্ধ—ফলে, দেশ জুড়ে বিরাট হাহাকার। অন্ন সমস্যা, মিছিল ইত্যাদি। দাবী-দাওয়া পেশ করবার জন্যে তাদের এক পেল্লায় মিটিং বসল। চারিদিক থেকে মালব দশার্ণ যৌধেয় চেদী—সব রাজ্যেরই ক্ষুধার্ত বিপন্ন চোরেরা এল। তাদের ঝাণ্ডা হয়ত-বা ছিল কিন্তু শ্লোগান হয়ত ছিল না, হাজার হোক বেআইনী-জমায়েত তো! এইবার সেই সভার প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ বলছি—শুনুন। মধ্যযুগের ভারতবর্ষের চোর সম্প্রদায়ের সর্বসম্মত নেতা ছিলেন শ্রীমূলদেব—পণ্ডিত, সুবুদ্ধিমান ও কুশলী। তিনি যা ফতোয়া দিতেন—উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম সব সমাজের চোরেরা তা মেনে নিত।

শ্রীমূলদেব বললেন যে বাঘা বাঘা সর্দারেরা তাঁদের জীবনের দুরন্ত অভিজ্ঞতার কথা গল্পের ছলে শোনাবেন। সর্দারের বক্তব্য শ্রোতাদের মেনে নিতে হবে। যিনি মানবেন না বা যাঁর মনে হবে সর্দার মিথ্যে বলচেন, সেই শ্রোতাকে প্রমাণ করতে হবে বক্তার মিথ্যে ভাষণের অপবাদ, নইলে সমস্ত দলকে ভালোরকম খাওয়াতে হবে।

এখন সর্দার পাঁচজন—প্রত্যেকের অধীনে পাঁচশো করে চেলা; সুতরাং গোটা দল বলতে আড়াই হাজার লোক। আড়াই হাজার লোককে খাওয়ানো তো চাট্টিখানি কথা নয়। যাই হোক, সবাই মেনে নিলেন প্রস্তাব, গল্প শুরু হল।

প্রথম বক্তা মূলদেব স্বয়ং

আমি তখন যুবক। আমার জেদ হল কৈলাসে গিয়ে গঙ্গা নদীকে মাথায় নিয়ে শিবের মতো ভঙ্গি করে দাঁড়িয়ে থাকব। ব্যস্—বেরিয়ে পড়লুম এক কমণ্ডলু আর ছাতা হাতে। পথে এক পাগ্লা হাতি তাড়া করল। উপায় না দেখে

লুকিয়ে পড়লুম ঐ কমণ্ডলুর ভেতরেই। কাণ্ড শোনো হাতি ব্যাটার—সেও ঢুকল কমণ্ডলুর খোলে। লুকোচুরি চলল। শেষে এক ফাঁকে কমণ্ডলুর মুখনল দিয়ে বেরিয়ে এলুম! বজ্জাত হাতিটা ছোট্ট চোখে তাই না দেখে সেও নলে ঢুকল। বেরুবার সময় তার ন্যাজটা গেল মুখনলে আটকে। আমি তখন একছুটে সোজা গঙ্গা পার হয়ে কৈলাসে পৌঁছে গেলুম। শিবের মাথা থেকে গঙ্গাকে চেয়ে নিলুম। নিজের মাথায় গঙ্গামাঈকে চাপিয়ে খাড়া দাঁড়িয়ে রইলুম ছ'মাস। তারপর এই ক'দিন মাত্র এসেছি উজ্জয়িনীতে।

এখন ভাই কণ্ডরীক, তুমি গুণী, সব কথাই খুলে বললুম। বিশ্বাস না হয় প্রমাণ করো যে আমার গল্প মিথ্যে। তাও না পার তো খাওয়াও সবাইকে—বড় খিদে পেয়েছে।

সুদর্শন কণ্ডরীক ধীরেসুস্থে উঠে দাঁড়িয়ে চাঁচা-ছোলা গলায় বললেন—আরে, এ তো সবই সত্যি। মহাভারত পুরাণে এর চেয়েও গাঁজাখুরি কত কথাই না আছে। তা কেউ কি অবিশ্বাস করচে? শক্তিমানের সবই সম্ভব। এখন শোনো ভাইসব আমার সামান্য অভিজ্ঞতার কাহিনী।

—আমি ছিলুম ছোটবেলা থেকেই দুরন্ত। খুব বেড়াতে ভালোবাসতুম। একবার যক্ষদেবের মেলা দেখতে কোনো এক গাঁয়ে গেছি। সেখানে ঘোড়ার খেলা খুব জমে উঠেছে—এমন সময় ডাকাত পড়ল।

যক্ষদেবের কৃপায় গাঁয়ের লোক ছিল গুণতুক্ করতে ওস্তাদ। তারা মানুষজন ঘোড়া-গোরু-সুদ্ধ ঢুকে পড়ল এক মস্ত মোটা পাকা শশার খোলে। কাণ্ড দেখে ভয়ে ডাকাতরা পালাল। তারপর এক রামছাগল এসে সেই শশাটা কোঁৎ করে গিলে ফেলল। অমনি কোত্থেকে এক অজগর সাপ এসে এক নিশ্বাসে ছাগলটাকে খেয়ে ফেলল। তারপর এক বুড়ো সারস এসে সাপটাকে পেটে পুরে পাশের বট-গাছে বসে ভরদুপুরে বিশ্রাম করতে লাগল। এখন সেখানে গাছের নীচে ছিল এক রাজার হাতি। সারসপাখিটা এক পা ঝুলিয়ে ঘুমোচ্ছিল, তার ঝুলন্ত পাটাকে দড়ি ভেবে মাহুত কষে কষে তাই দিয়ে রাজার হাতিটাকে বেঁধে দিল। ওদিকে কিছু পরেই সারস যেমনি ঝুলন্ত পা-টা তুলতে গেল অমনি বাঁধা হাতিটাও সঙ্গে সঙ্গে উঠে গেল বটগাছের ডালে। 'হাতি চুরি হাতি চুরি'—রাজার তাঁবুতে শোরগোল। বড় বড় শিকারীরা এসে চোখা চোখা বাণ মেরে আধ-ঘুমন্ত সারসটাকে পেড়ে ফেললে। তার পেট চিরতে প্রথমে বেরুল অজগর সাপ, সাপের ফুলো পেট থেকে বেরুল রামছাগল, ছাগলের পেট থেকে শশা, শশার পেট থেকে

একদল মানুষ, খেলুড়ে-ঘোড়া-বটগাছ, একে একে সব বেরুতে লাগল। সেই মেলা থেকেই তো সোজা উজ্জয়িনীতে এলুম আজকে তোমাদের কাছে। জনতা একবাক্যে মাথা নেড়ে বললে—এ সবই সত্যি। খাঁটি বাস্তব অভিজ্ঞতা, এতটুকু মিথ্যের মিশেল নেই।

এবার আত্মকাহিনী বলতে উঠলেন বিখ্যাত ধূর্ত গর্বিত এলাষাঢ়।

—আমি যৌবনে অনেক গবেষণা করবার পর একদা এক মৃত্যুঞ্জয়ী রসায়ন আবিষ্কার করি। সেই অমূল্য রসায়ন পান করে অমর হলুম আর দুনিয়ায় নানা ঐশ্বর্যবিলাস একে একে সব ভোগও করলুম। দুষ্টু লোকের হিংসে জেগে উঠল। তাই একদিন এক উদ্ধত ছোকরা ডাকাত এসে আমার মুণ্ডুটি কেটে বাড়ির কুলগাছে ঝুলিয়ে দিয়ে গেল। কী কাণ্ড বাবা—মুণ্ডুটা সেই কুলগাছ থেকে দিব্যি ডাঁসা ডাঁসা কুল বেছে বেছে খেতে শুরু করে দিলে। তাই দেখে প্রথমে যারা ভয়ে পালিয়েছিল, ছুটে এসে কাটা মুণ্ডুটা ধড়ে বসিয়ে দিলে। আর তাই দেখো না—আজ আমি সজ্ঞানে তোমাদের কাছে এই নির্ভেজাল সত্য আখ্যানটি বিবৃত করলুম।

জনতা বললে—হ্যাঁ, এরকম কথা রামায়ণে মহাভারতে আঠারো পুরাণেও বিস্তর পাওয়া যায়। তা সেসব সত্যি হলে এলাষাঢ়ের কাহিনী মিথ্যে হওয়ার কোনো কারণ নেই।

চার নম্বরের ওস্তাদ শশ উঠলেন তাঁর বাস্তব জীবনের রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার কথা বলতে—পাহাড়ের কোণে আমাদের একটা ক্ষেত ছিল। একদিন সেই ক্ষেতে গেছি, ও মা! পাহাড়ের চুড়ো থেকে দুড়্‌দাড় করে তেড়ে এল এক পাগ্‌লা হাতি। আমি ভয় পেয়ে রেড়ি গাছে উঠলুম। খ্যাপা হাতি রেড়ি গাছ ধরে নাড়ায়—ফল পড়ে আর তেল ঝরে। খানিক বাদে মস্ত তেলের পুকুর হয়ে গেল আর সেই পুকুরেই ডুবে হাতিটা মরল। তাই না দেখে আমি গাছ থেকে নেমে চট্ করে হাতির চামড়াটা খুলে নিয়ে সুন্দর একটা থলে, যাকে বলে মশক, তাই বানিয়ে ফেললুম। আর এক মশক খাঁটি রেড়ির তেল নিয়ে নিজের গাঁয়ে ফিরলুম। সেখান থেকে ভাই, আজকের এই সভার কথা শুনে সোজা এসেচি। এখন কি বলবার আছে তোমরাই বলো।

সবাই সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠল—এমন অপূর্ব সত্যভাষণ তারা আর শোনেনি।

সর্বশেষে উঠে দাঁড়ালেন মহিলাকুল-শিরোমণি খণ্ডপানা। এঁর অধীনেও পাঁচশোজন দেশগৌরব সাকরেদ মেয়ে-চোর ছিল। সভাভঙ্গের কাজ মনে হল

খণ্ডপানাই করবেন।

অতি মিষ্টি হেসে খণ্ডপানা বললেন যৌবনে তিনি ছিলেন অপূর্ব সুন্দরী—ইন্দ্র, অগ্নি, বায়ু, সূর্যদেব এসব দেবতাদের সঙ্গে তাঁর প্রণয় হয়েছিল। সভার লোকেরা বললে—এমন তো কুন্তীদেবীরও হয়েছিল, সুতরাং অবিশ্বাসের কিছু নেই। খণ্ডপানা একটু রেগে নিজমূর্তি ধরে বললেন—বর্তমানে তিনি রাজবাড়িতে কাপড় কাচেন (অর্থাৎ ধোবানি)। এখন রাজার হাজার দুই-আড়াই কাপড় চুরি গেছে। খণ্ডপানা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন এ-সভার লোকেরা সেসব চোরাই কাপড় পরে আছেন। তাঁরা সেই কাপড় ফেরৎ দিন। সবাই বিপদে পড়ে খণ্ডপানার কাছে নতি স্বীকার করেও অর্থাভাবে তার কাছেই ভোজন প্রার্থনা করলে।

খণ্ডপানা সবাইকে আশ্বাস দিয়ে একলাই উপায় খুঁজতে চলে গেলেন। তিনি অচিরে ভয়ংকর শ্মশান থেকে সদ্যোমৃত একটি সুন্দর শিশুর দেহ কুড়িয়ে এনে, সেটি কাঁধে নিয়ে চললেন শ্রেষ্ঠী-চত্বরে।

উজ্জয়িনী শহরের খানদানি এক শ্রেষ্ঠীর সদরে ঢুকে বিরাট চেঁচিয়ে, নানা উৎপাত শুরু করে দিলেন খণ্ডপানা। শ্রেষ্ঠীর হুকুমে গৃহভৃত্য এসে খণ্ডপানাকে দূর করে দেবার চেষ্টা করতেই খণ্ডপানা পতনের অভিনয় করে মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়লেন এবং কোলের সন্তানের নৃশংস মৃত্যুর জন্যে শ্রেষ্ঠীকে দায়ী করে ভয়ঙ্কর কান্নাকাটি শুরু করে দিলেন।

শ্রেষ্ঠী বেগতিক দেখে খণ্ডপানাকে প্রচুর অলংকার দিয়ে তার মুখ বন্ধ করলেন। আর সেই রত্নালঙ্কার বাজারে বেচে তখুনি এক বিরাট ভোজের আয়োজন হল। (সে ভোজের খাদ্যতালিকা দিতে পারলুম না বলে দুঃখিত)। চারিদিকে খণ্ডপানার জয়জয়কার। হবে নাই বা কেন ? শাস্ত্রে বলে, মেয়েরা যেমন মিথ্যে কথা বলতে আর ঠকাতে পারে এমন শিক্ষিত পুরুষেও পারে না।

অষ্টম শতকে গল্পটি লিখেছিলেন অশেষ গুণাধার হরিভদ্র সূরী প্রাকৃত ভাষায়। খুব সংক্ষেপে তার ভাবটুকু মাত্র বলা হল, রাজস্থান বেড়াতে গিয়ে দেখি আচার্য হরিভদ্রের মূর্তি চিতোর দুর্গে।

ভাষাতত্ত্বের বিশিষ্ট পণ্ডিত সুলেখক হরিভদ্র সূরী—এতবড় দার্শনিক পণ্ডিত কী করে এমন নিরেট গাঁজার কাহিনী রচনা করলেন ! এর অনুরূপ কথা কোথাও পাইনি। মহাভারতে গল্পের শেষ নেই, তাদের বৈচিত্র্য প্রচুর হলেও তা এমন নয়। 'কথাসরিৎসাগর' সত্যিই কথার সমুদ্র হলেও মেঘে চড়ে আকাশে ওড়ার

বেশি অবাস্তব গল্প খুব একটা নেই, এবং প্রায় সংস্কৃতের সব কাহিনী, কাব্য ও নাটকে যুদ্ধের সঙ্গেই প্রেম সৌন্দর্য মাধুর্য, মহাভারতের ঈর্ষ্যা হানাহানি যুদ্ধ এসবের কিছু কিছু মাত্রা-ছাড়ানো থাকলেও হাস্যকর নয়। প্রাকৃত ভাষায় সবচেয়ে বড় হল 'কাহিনী' (ত্রিষষ্টি শলাকা পুরুষ—'তিসট্ঠি শলাআ পুরিস চরিউ')—'শলাকা পুরুষ' হলেন চিহ্নিত পুরুষ। ইদানিংকালের জৈনশাস্ত্র ও সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা গণেশ লালওয়ানী অনেক বৎসর ধরে বহু অনুবাদ করেছিলেন, এই বই শেষ হবার আগেই ১৯৯৪ সালে তিনি হঠাৎ পরলোক গমন করেন। লালওয়ানীজি বলেছিলেন গল্পটার আলোচনা করবেন। ত্রিপিটকাচার্য বেণীমাধব বড়ুয়ার কাছেও আমরা যাই। এরপর বিচিত্র কথায় যাঁর আগ্রহ ছিল, ড. সুকুমার সেনের কাছেও যাবার কথা ছিল। ঘটনা ও দুর্ঘটনার ফেরে যেতে পারিনি। মূল গল্পটির নাম "ধূর্তাখ্যান", লেখক দার্শনিক আচার্য হরিভদ্র। ভাষাতত্ত্ববিদ পণ্ডিত রাম-আধার সিং হরিভদ্রের এই দুষ্প্রাপ্য বইটি আমাকে দেন। তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাই।

মোহরের ঘড়া

প্রায় চল্লিশ বছর আগেকার কথা বলছি। রাজধানী দিল্লির দক্ষিণে ভরতপুর রাজ্য। মহারাজার সুন্দর প্রাসাদ আর দেশ-দেশান্তরের হরেক রকম উড়ন্ত পাখিদের আস্তানা দেখতে এখনো বহুলোক সে-দেশে বেড়াতে যায়। রাজস্থানের সর্বত্র যেমন ভরতপুরেও তাই—চারিদিকে ছোট ছোট নিচু পাহাড় বা ডুঙ্গর। মাঝখানে বেলে জমি। কষ্ট করেই চাষবাস হয়, দূরে হলদে বালিতে ভরা আদিগন্ত জমিতে গাছপালা প্রায় নেই। বাসিন্দারা অধিকাংশ চাষী—হাতে বাঁধানো লাঠি, মাথায় নানা রঙের ছোবানো বাঁধনী কাপড়ের পাগড়ি, গায়ে দিশি মোটা খদ্দরের রেজির সঙ্গে তুলোভরা জামা। পথেঘাটে মেয়েদের বিশেষ দেখা যায় না। ঘাঘরা-লুগড়ির সঙ্গে পাঁচ-সাত-দশ সের রুপো আর কাঁসার গয়না পরে মস্ত ঘোমটা টেনে তারা তখন চাষের ক্ষেত আর কুয়োতলা ছাড়া আর কোথাও তেমন যেত না। মেয়েরা এক কথায় সবাই সুন্দরী আর ছেলেরা ভারী জোয়ান। একটু-আধটু লুটপাটের বদনাম ভরতপুরের মানুষের আবহমানকাল থেকে আছে। রাজস্থানি লোকেরা তাই ছড়া কেটে বলে—

গুজর রণঘর দো
কুত্তা বিল্লি দো,
ই দোন হো
তো খুলে কিবাড়ী থো।

এই ভরতপুরের হুলানপুরা গ্রামে ছিল ভোরেয়া গুজরের বাড়ি। তার ক্ষেতের একপাশে বাঁধের মতো একটুখানি উঁচু জমি—সেখানে ক্ষয়ে-যাওয়া একজোড়া সাপের পাথুরে মূর্তি বহুকাল ধরে পড়ে থাকত। রাজস্থানে তো পায়ে পায়ে শহিদের আস্তানা, নইলে সতীচৌরা। কবেকার পুরনো ওসব ব্যাপার নিয়ে গরিব লোকেরা বেশি মাথা ঘামাত না, তবু ভোরেয়া ওই অংশটুকু সযত্নে তার চাষের এলাকা থেকে বাদ দিয়েছিল।

গ্রামের নিস্তরঙ্গ জীবনে সে-বছর মাঘ মাসে হঠাৎ খুব শোরগোল উঠল। স্বয়ং মহারাজা শিকারে এলেন ইংরেজ বন্ধুবান্ধব নিয়ে। সারি সারি সুদৃশ্য তাঁবু, আলো, বাজনা, শিকারি কুকুর, বন্দুকধারী সিপাই, অগুনতি খিদ্‌মৎগার, সাজপরানো

বাহারী ঘোড়া—কাকে ছেড়ে কাকে দেখবে, গাঁয়ের লোকেরা ভেবে পেল না। ক'দিন ধরে হৈহল্লায় চমকে উঠতে হঠাৎ একদিন তারা শুনল শুয়োর, হরিণ আর বিস্তর পাখি মেরে মহারাজা শহরে ফিরে গেছেন। মহারাজার চাক্ষুস দর্শন মিলল না—মাঠে পড়েছিল শুকনো মাংস আর বিস্কুটের টিন, খালি বোতল। তামাকের পাইপ আর কার্তুজের খোল। ছোট ছোট ছেলেরা বিষণ্ণ মনে তাই কুড়িয়ে জড়ো করতে লাগলো। পাশের নাগলাছেলা গাঁয়ের ছেলেরাও এসে পড়ায় সম্পত্তি উদ্ধারের খেলা বেশ জমে উঠল। ক্রমে কিছু ছেলে এদিক-সেদিক করে আস্তে আস্তে চম্পট দিল। শেষ পর্যন্ত খোলা মাঠে পড়ে রইল জিৎমল (জিতু), সমবয়সী বন্ধু বাবু ও তুলসী। হঠাৎ তুলসী লাফিয়ে ভোরেয়ার সেই বাঁধের ওপর উঠে দাঁড়াল, সঙ্গে সঙ্গে জিৎমল আর বাবুও। তুলসীর খোন্তায় কী একটা ঠং করে পাথুরে শব্দ। জোড়া সাপ সরিয়ে ঘাসের জঙ্গল সাফ করে তিনজোড়া হাতের চেষ্টায় মাটির নিচ থেকে উঠল কালো রঙের একটা মস্ত হাঁড়ির মতো, লোহা কী তামার হবে। মুখের ময়লা ফেলে দিতে তার থেকে বেরুল পেতলের ঘুঁটির মতো হিজিবিজি ছাপ দেওয়া। কী এগুলো ? কোটের বোতাম হবে বোধ হয়, সেপাইদের পোশাকে যেমনি থাকে। জিতু বললে, আমি পেয়েছি, বাবু বললে, আমি তুলেছি —তুলসী চেঁচিয়ে উঠল—আমি যেই বললুম চৌরীর ঢিবির ওপর উঠতে, তাই না তোরা এলি ? এখন চল—চকচকে বোতাম বাড়ি নিয়ে যাই। অনেকদিন ধরে ঘুঁটি খেলব।

ভাগ্যিস সেদিন ওদের সঙ্গে কোনো থলে ছিল না, নইলে সেই তামার ঘড়াটা হয়ত ওরা মাঠেই ফেলে যেত। যাই হোক, সেই মস্ত ভারি ঘড়াটা পালাপালি করে ওরা তিনজনে মাঠ থেকে বয়ে বাড়ি আনল। তিন বাড়ি থেকে মা, দাদী আর নানীরা ভিড় করে এলো ওদের সম্পত্তি দেখবার জন্যে। একটু পরেই লোক গেল ওদের বাপেদের ক্ষেতে থেকে ডেকে আনতে। শুধু পেতলের বোতাম নয়, অন্ত যেন কিছু। পাড়ার মধ্যে বিচক্ষণ ছিলেন ধনপতের মা। শহরে যাতায়াত আছে, অনেক দেখাশোনা আছে তাঁর, তিনিই এ পরামর্শ দিলেন।

ছেলেদের বাপেরা ক্ষেত থেকে ছুটে এসে দেখে ঘরের মধ্যে ময়লা চাদরের ওপর রাশি রাশি টাকা—সব হলদে রঙের। তাহলে কি সোনার ? সোনার টাকা ওরা কেউ হাত দিয়ে ছোঁয়া দূরে থাক, চোখেও দেখেনি। মাথা ঝিমঝিম করতে লাগল—কারও ঘরেই একরত্তি সোনা নেই। ওদের মেয়েদের কাঙ্গি, চুড়ি, তাবিজ, বোরলা, পাটা, পিপল, পাইজোড়—সবই হয় কাঁসার। দুটো-একটা চাঁদির।

দিনদুপুরে ওদের ভিরমি খেতে দেখে ধনপতের মা পাখার বাতাস দিয়ে গুড়জল খেতে দিলেন, আর গাঁয়ের পুরুতঠাকুরকে ডেকে পাঠালেন। পুরোহিত আর মোড়ল মিলে বিধান দিলেন—যখের ধন গেরস্তের ভোগে আসে না সহজে। তাই পুরোহিত পাঁচ, মোড়লের দশ আর থানার দারোগার কুড়িখানা মোহর আগে তুলে রেখে তারপর আত্মীয়-বন্ধুদের মধ্যে ভাগাভাগি, পুরনো দেনা শোধ, নতুন জমি কেনা—সব হোক।

তাই হল, খাওয়ার ধুম পড়ে গেল। মিশ্রির লাড্ডু, মগ্‌দল আর ঘিওর প্রথম ঢুকল গ্রামে।

স্যাকরাবাড়ি খবর গেল। জিতু, তুলসী আর বাবু রাজপুত্তুরের মতো সেজে গাঁ-ময় দাপিয়ে বেড়াতে লাগল। ওরা এখন নতুন গাইবলদ কিনবে, হনুমানজি আর গণপতজির মন্দির বাঁধিয়ে দেবে শহর থেকে পাথর এনে। মহারাজার শিকারের সময়ও গাঁয়ের লোক এমন মেতে ওঠেনি। কিন্তু এত সুখ সইল না। মোহরগুলো পোঁতা ছিল যে ভোরেয়ার জমিতে, সে ভাগ ছাড়বে কেন? খবর গেল থানায়। থানার অফিসার-ইন-চার্জ সমস্ত ঘটনাটি তলিয়ে দেখে জরুরি খবর পাঠালেন ভরতপুর হেড-কোয়ার্টাসে। সহজ কথায়, সোনার দখল কেউ হারাতে রাজি হল না, তাই বিরাট পুলিসবাহিনী এনে গোটা গ্রাম ঘেরাও করে, পাইকারি জরিমানার ভয় দেখিয়ে এবং ব্যাপকভাবে তল্লাশি করে উদ্ধার করলেন প্রায় দু'হাজার মোহর। গ্রামের মেয়েরা আবার একজোট হয়ে যখন গুজরের ঘরের মেয়েদের সোনার গয়না পরার কুফল নিয়ে সমস্বরে ধিক্কার দিতে থাকল, তখন কাগজে বেরুল ছোট্ট একটি খবর—দিল্লি শহর থেকে ১২৯ মাইল দক্ষিণে ভরতপুর রাজ্যের এক গ্রামে ক্ষেতের মধ্য থেকে তামার পাত্রে রক্ষিত প্রায় দু'হাজার প্রাচীন স্বর্ণমুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে।

আঠারো শতকের শেষ থেকে ভারতবর্ষের নানা অঞ্চল থেকে নানাভাবেই বহু ধনসম্পদ পাওয়া গেছে। নাসিকের কাছে এক জায়গায় তের হাজার প্রাচীন মুদ্রার আবিষ্কার হলেও তার অধিকাংশই ছিল রুপো আর তামা। আর ভরতপুরের এখানে সমস্তই সোনা শুধু নয়, সবই গুপ্তযুগের। এর আগে বা এর পরে কোথাও এমন ঘড়াভরা মোহর রূপকথার গল্পের মতো সত্যি হয়ে দেখা দেয়নি। এ ধনভাণ্ডার আবিষ্কারের পরোক্ষ কৃতিত্ব কিন্তু সেই অনামা পুলিস অফিসারের। দারোগার পাওনা কুড়িখানা মোহরের পাঁচগুণ চড়িয়ে রাতারাতি নবাব হওয়ার অনায়াস পন্থাটি তিনি সেদিন আশ্চর্যরূপে এবং প্রসন্ন মনে ত্যাগ করেছিলেন

বলেই এই আবিষ্কারের খবর জগৎ জানতে পারে এবং তাঁর এই দুরদর্শিতা ও সততার দ্বারাই ভারতবর্ষের গুপ্তযুগের বহু অজ্ঞাত তথ্য পরিষ্কৃত এবং সমর্থিত হয়। বহুদিন তল্লাশি চালিয়ে ভদ্রলোক আরো জানতে পারেন যে, ২৮৫টি স্বর্ণমুদ্রা গ্রামের লোকেরা গোপনে গালিয়ে নষ্ট করে ফেলেছে। তখনকার দিনে দেশীয় রাজ্যে সোনার ভরি হিসেব করে প্রত্যেকের ৪৫ টাকা করে জরিমানা আদায় করার পর মোট ১২,৬৮০ টাকা রাজ্য সরকারে জমা পড়ে। কিন্তু গুপ্তযুগের দু'শ পঁচাশিটি স্বর্ণমুদ্রা এইভাবে গ্রামের লোকের লোভ ও নির্বুদ্ধিতার ফলে চিরকালের জন্য লুপ্ত হয়ে যায়। তার মধ্যে গুপ্ত সম্রাটদের কোনো বিশেষ নতুন ধরনের মুদ্রা থাকাও খুবই সম্ভব ছিল। কিন্তু এ দুঃখের আর কোনো সান্ত্বনাই নেই। এই অত্যন্ত মূল্যবান আবিষ্কারকাহিনী সম্বন্ধে থানার ফার্স্ট ইনফরমেশন রিপোর্ট গ্রামবাসীর সাক্ষ্য ও জবানবন্দি—সবই আমাদের জন্য রক্ষিত থাকা উচিত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তা হয়নি। কারণ, আমাদের দেশের সংবাদপত্র এইসব তুচ্ছ সংবাদ নিয়ে ব্যানার হেডিং করতে পছন্দ করে না।

যাই হোক, অচিরে মহারাজা সওয়াই ব্রজেন্দ্রসিংজি এই আবিষ্কারের বিস্তারিত কাহিনী (যার মূলে ছিল তাঁর শিকারপর্ব) শুনে উল্লসিত হলেন এবং তাঁর শিক্ষা বিভাগকে নির্দেশ দিলেন একটি বিজ্ঞানসম্মত ক্যাটালগ তৈরি করবার জন্যে। মহারাজা নিজে তাঁর সম্পদ এবং সামর্থ্য নিয়ে এগিয়ে না এলে এই গুপ্ত মুদ্রার ক্যাটালগটি সম্পাদিত হওয়া সম্ভব ছিল না।

তখন শ্রী অনন্ত সদাশিব আলতেকার ছিলেন প্রাচীন মুদ্রাতত্ত্ব বিভাগের চেয়ারম্যান। মহারাজার আমন্ত্রণে তিনি কাশীপ্রসাদ জয়সবাল ইনষ্টিটিউট এবং পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ থেকে ছুটি নিয়ে ভরতপুরে এলেন এবং তাঁর প্রতিভা ও পরিশ্রমের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করে বহু বছর ধরে এই অসাধারণ ক্যাটালগটি সম্পাদনা করেন। ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় রাজ্যে বিপর্যয় দেখা দিলেও মহারাজা তাঁর ব্যক্তিগত ধনভাণ্ডার এর জন্য উন্মুক্ত করে দেন। তাই প্রত্যেকটি মুদ্রার ছবি দিয়ে, ওজন করিয়ে পাঠনির্ণয়, বিভিন্ন সূচি ও বিস্তৃত ইতিহাসসহ বইখানি এ-দেশের অন্যতম সেরা প্রেস এলাহাবাদের ল' জার্নাল প্রেসে ছাপা হতে লাগল। আর্টপ্লেটে ছাপা হল বিদেশে—লণ্ডন শহরের চিস্-উইক প্রেসে। এরকম সুসম্পাদিত ও সুমুদ্রিত ক্যাটালগ এ-দেশে এই প্রথম। কথা উঠল নাম নিয়ে। প্রাপ্তিস্থানের হিসেবে হুলানপুরার এবং উদ্ধারকর্তার গৌরবে নাগালছেলার দাবি কোনোটাকেই উপেক্ষা করা যায় না। কাছাকাছি

কোনো মন্দির, দুর্গ এমনকী নদীও নেই, তাই বিরোধ মেটাতে রেলওয়ে জংশনের নামে এর নাম রাখা হল 'বেয়ানার ধনভাণ্ড'।

এতে ছিল মহারাজাধিরাজ প্রথম চন্দ্রগুপ্তের মুদ্রা দশটি, সমুদ্রগুপ্তের একশ তিরাশিটি, কাচের ষোলটি, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের ন'শ তিরাশিটি, কুমার-গুপ্তের ছ'শ আটাশটি এবং (স্কন্দগুপ্ত) বিক্রমাদিত্যের একটি।

এর থেকে অনুমান করা সম্ভব যে স্কন্দগুপ্তের যুগে প্রবল হূন আক্রমণের দিনে কোনো অজ্ঞাতনামা ধনী মানুষ তাঁর সম্পদ ওইভাবে তামার পাত্রে পুরে মাটির নিচে রাখেন—যা তুলে নেওয়া যুদ্ধের কারণে সম্ভব হয়নি এবং ১৯৪৬ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত পনেরশ বছর ধরে তা মাটির নিচে চাপা পড়ে থাকে।

এই আবিষ্কারের কয়েকমাস পরেই উত্তরপ্রদেশে এক বছরেরও বেশি সময় কাটানোর সুযোগ আমার ঘটে। এবং ভরতপুর, ডিগ ও জয়পুর অঞ্চলের কয়েকজন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মুখে এই ঘটনা শুনে আমার ছাত্রজীবনে আমি যে কী পরিমাণে বিমুগ্ধ ও বিহ্বল হয়েছিলুম, তা আজও আমার পক্ষে ভাষায় বলা সহজ নয়। কাশীর রাজঘাটে একই সময়ে নানাযুগের প্রত্নকীর্তি আবিষ্কৃত হতে থাকে—কিন্তু সে কথা আজ থাক। বয়েসের অভিজ্ঞতায় আজ বুঝতে পারি কুবেরের ধনভাণ্ডার পায়ের নিচে থাকলেও তাকে খুঁজে পাওয়ার, চিনে নেওয়ার এবং ধরে রাখার ক্ষমতা সকলের থাকে না।

(সমস্ত তথ্য আলতেকারের ক্যাটালগ থেকে নেওয়া)।

ট্রামের পা-চালি

অধ্যাপক সুকান্ত চৌধুরি সম্পাদিত বিখ্যাত বই অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেসের 'ক্যালকাটা : দি লিভিং সিটি'-র প্রথম খণ্ডে ট্রাম নিয়ে বেশ কিছু কথা আলোচনা করেছেন পি. থনকপ্পন নায়ার। ওই লেখার সঙ্গে প্রথম যুগে চিৎপুর অঞ্চলে ট্রামের ছবিও আছে। চিৎপুরে লাইন পাততে গিয়ে মাটি খোঁড়ার ফলে জোড়াসাঁকোর গলির মুখ বন্ধ হয়ে যায়। অনেক আবেদন-নিবেদনের পর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কোম্পানিকে উকিলের চিঠি পাঠাবার পরে গলি সাফ হয়। এসব কথা 'কলকাতায় চলাফেরা'য় ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বেশ ফলাও করে লিখে গেছেন। রাধারমণ মিত্র মশাই ট্রাম চলার ইতিহাস যা লিখেছেন তার পুরোটাই অন্য বই থেকে নেওয়া। পুরনো কথা তো পুরনো বই থেকে নিতেই হবে, তবে স্বীকার করলে আর ঝামেলা থাকে না।

রাধাপ্রসাদ গুপ্ত 'তবু ট্রামের কোনো ইতিহাস নেই' বলে নানা মালমশলা ঘেঁটেছেন—যেমন আই সি এস গুড সাহেবের 'মিউনিসিপ্যাল ক্যালকাটা'। এতে কবে ট্রাম লাইন পাতবার প্রস্তাব এল, কবে কারা সমর্থন করলে, কবে লাইন পাতা হল—সবই সন-তারিখ ধরে বলা হয়েছে। ঘোড়ার ট্রাম বন্ধ হয়ে শেষ পর্যন্ত ট্রাম ইলেকট্রিকে চলতে শুরু করে সেই ১৯০২ সালে, আজ তার ৯২ বছর বয়স। জীবনতারা হালদারের ছোট্ট বইটা আজ আমার নেই—'লেখনী পুস্তিকা ভার্যা পরহস্তগতং গতাঃ', কলম বই আর ভার্যা পরের হাতে গেলে আর ফিরে আসে না, এ তো জানা কথা। এখন বলবার মতো নতুন কথা আমার কাছে বেশি কিছু নেই। তবু ছেলেবয়েস থেকে ট্রামে চড়তে ভালোবাসতুম। তাই বলতে যাচ্ছি।

অল্প খরচে আরামে যাতায়াতের জন্যে এমন গাড়ি তখন আর ছিল না, এখনও নেই। দক্ষিণ, মধ্য আর পূর্ব কলকাতা থেকে দলে দলে বৃদ্ধেরা সকাল-বিকেল ময়দানে বেড়াতে আসতেন। ময়দানে এই হাঁটাটুকু না হলে তাঁদের ভাত হজম হতো না। যাঁরা অবসর নিয়েছিলেন তাঁদের জন্যে ছিল 'পাম গ্রোভ ক্লাব', যাঁদের চাকরি ফুরোয়নি তাঁদের জন্যে 'প্যাগোডা' ক্লাব (এখন তো সেই রেঙ্গুনি প্যাগোডা, ইডেন গার্ডেন, কার্জন পার্ক কিছুই নেই)। তখন সবাই ট্রামের খদ্দের,

পকেটে মান্থলি। মান্থলির টাকা ঠিক সময়ে জমা দেবার বিজ্ঞাপনও ট্রামের গায়ে লটকানো থাকত। অল সেকশন মান্থলি থাকলে নিজেকে যেন গাড়ির কিংবা শহরের মালিক বলেই মনে হতো। সারাদিন উত্তর দক্ষিণে নেচেকুঁদেও মানুষ ক্লান্ত হতো না। সকালের দিকে 'মুক্তবায়ু সেবনে'র জন্যে কতরকমের তালেবর ব্যক্তি—ডাক্তার, এটর্নি, মুন্সেফ, জজ, ডেপুটি নিয়মিত যাতায়াত করতেন। একে অন্যের আলাপী হয়ে পড়তেন। ফার্স্ট ক্লাসের ভাড়া চার পয়সা, সেকেণ্ড ক্লাসের তিন পয়সা, দুপুরবেলা এক পয়সা করে কমে 'চিপ মিডডে' হতো, এর সঙ্গে আবার ট্রান্সফার বলে একটা ব্যাপার ছিল। একটা টিকিট খিদিরপুর কি বেহালা যাবার জন্যে কেটে সেইটে বদলে অন্য জায়গায় যাওয়া যেত। রবিবার চার কিংবা ছ' আনা দিয়ে 'অল্ ডে' টিকিটের ব্যবস্থা অর্থাৎ সমস্ত দিন যে-কোনো ট্রামে যে কোনো জায়গায় যাওয়ার ব্যবস্থা C.T.C. স্পেশালের কল্যাণে ছিল। বেকার ছেলেরা এই এ-মুড়ো থেকে ও-মুড়ো অব্দি চষে কী আনন্দ যে পেতেন!

আমার বাবার সাধুতার ব্যাপারে কিছু বাতিক ছিল। বাইরে বেড়াতে গেলে মান্থলি টিকিটখানা চাবি বন্ধ করে যেতেন। কোম্পানির আপিসে গিয়ে বলেছিলেন টিকিটের গায়ে মালিকের বয়েস লেখার ব্যবস্থা করতে। কোম্পানি বলেছিল, টিকিট অন্যে ব্যাভার করুক, আমাদের সিট বোঝাই যাত্রী থাকলেই হল। একটা মান্থলিতে তো একসঙ্গে দুজন যাচ্ছে না। বাড়ি এসে বাবা মাকে বলেছিলেন—ইংরেজরা নিজেরাই আইন ভাঙছে, এবার রাজত্বও যাবে দু'পাঁচ বছরে।

সে যুগে গাড়িতে ভিড় ছিল না, ঝাঁকুনি ছিল না, অনেক যাত্রীই উঠে পছন্দসই সিট দখল করে বই খুলে বসতেন। অধুনা অক্সফোর্ড প্রবাসী নীরদ সি. চৌধুরির একান্ত ভক্ত শিষ্য এটর্নি বিমলচন্দ্র চক্রবর্তী বলেছিলেন, রোজ ট্রামে বসে আরামে নভেল পড়ে পড়েই ইংরিজি ভাষাটা অনেকটা রপ্ত করেছিলুম। প্রথম জীবনে ভদ্রলোক ছিলেন বি পি সি সি-র লাবণ্যপ্রভা দত্তের সেক্রেটারি। ইংরিজিতে রীতিমতো 'দড়'। ট্রাম কোম্পানির এখন এসপ্ল্যানেড, বালিগঞ্জ, বেহালা, গ্যালিফ স্ট্রিট, বেলগেছে, গড়েহাট, কালীঘাট, খিদিরপুর, নোনাপুকুর, পার্কসার্কাস, রাজাবাজার, শ্যামবাজার, টালিগঞ্জ এইসব ডিপো চালু আছে (নামের কম-বেশি হতে পারে)। তিরিশের দশকের গোড়ায় কোম্পানি দুটি ছোট্ট সচিত্র পুস্তিকা বের করে। মনে পড়ে, বোধ হয় দু'পয়সা দাম ছিল। তাতে ভোর চারটেয় প্রথম ট্রাম রাস্তায় বেরোবার আগে ডিপোয় কি কি কাজ হয়,

ধোলাই, সাফাই, ড্রাইভার, কণ্ডাক্টরের কাজ বুঝে নেওয়া, ডিপোর খোঁজখবর ইত্যাদি ছিল। আমার একান্ত আদরের বস্তু চিরদিন গরিবের সাবানের বাক্সে থাকতে চাইল না, তাই বয়েস বাড়তে ডানা মেলে অন্যত্র চলে গেছে। আজ এখনও হাতে পেলে যথাসাধ্য দাম দেবার চেষ্টা করব। কোনো পাঠকের কাছে এগুলো থাকলেও থাকতে পারে। রসরাজ অমৃতলাল আত্মস্মৃতিতে লিখেছেন—তিনি একজন মহাগুণী ব্যক্তিকে জানতেন যিনি নিজের হাতে কাঠ চেরাই করে হাতির দাঁতের নকশা তুলে আস্ত একটি সেতার গড়েছিলেন। আমাদের নিজের চোখে দেখা শেয়ালদা কোর্টের উকিল রজনীনাথও ছিলেন নানা গুণের গুণী। দর্জির মতো সেলাই করে, হালুইকরের মতো রান্না করে, পোটোর মতো পট আঁকার পরেও ইনি নিজের হাতে সেগুন কাঠ চিরে ট্রামের আস্ত একখানি বগিই তোয়ের করেছিলেন। ড্রাইভারের দাঁড়াবার খোপ, জানলা—তাতে গরাদে খড়খড়ি, সিটে যেখানে লোহা থাকার কথা সেখানে কালো রঙ দিয়েছিলেন, দু'সারি সিট মুখোমুখি, মাঝখানে রাস্তা। গাড়ির ভেতরে একজোড়া ছোট্ট তাস রেখে দিয়েছিলেন (সেকেণ্ড ক্লাস ছিল না)।

প্রথমদিকে তাঁর এই গাড়ি দেখে মক্কেলরা কিনতে চেয়েছিলেন—উনি দেননি। মোকদ্দমায় মন ছিল না তেমন, বাড়িতে ঠিক গুণীর আদর কোনোদিন পাননি। তাঁর চিলেকোঠার পাশে ভাঙাচোরা জিনিসের মধ্যে হেলাফেলায় সেই ট্রাম পড়ে থাকতে দেখেছি। মিলের শাড়ির পাড়ে ট্রামগাড়িও দেখেছি শ্রীরামপুর মাহেশে (যেখানে রথ দেখতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের রাধারাণী হারিয়ে যায়)। সেখানে খগেন্দ্রনাথ মিত্তির, আমাদের দূর সম্পর্কের কাকার বাড়ি। তাঁদের বউ-বাজারে একসময় কাপড়ের দোকান ছিল। কাকিমার সংগ্রহে তিরিশ-পঁয়ত্রিশ রকম পাড় নকশাদার পদ্মলতা, গোলাপলতা দেখেছি। 'ক্লকঘড়ি' ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল ট্রামগাড়ি, জোড়া ময়ূর পাড়, আরও নানারকম দিয়ে কাঁথা সাজাতেন বড় চমৎকার। এমনটি আর দেখিনি। মাড়োয়ারী যতনলাল লুনিয়ার সংগ্রহে ছিল আলমারির ড্রয়ার ভর্তি ভর্তি বিস্তর শাড়ির পাড় (বাসনওয়ালির কাছে কেনা), তাঁর কাছে বাস ট্রাম এসবের ছবিও ছিল। কাপড়ের গাঁটরির ওপরে গঁদ দিয়ে সাঁটা কুপনে ইংরিজিতে ম্যানচেস্টার লেখা সপরিবারে শিব-দুর্গার ছবি ছিল। বড়বাজারের গুপী খান্না আমাকে দেখিয়েছিলেন। এখন দুটো-একটা ছড়া বলি—ইংরিজি ছড়াটার শুরু Punch Brother Punch, জানি না কার লেখা। বাংলা পদ্যটা দিদির মুখে শোনা—'কনডাকটর যখন তুমি ভাড়া কোন পাবে /

প্যাসেঞ্জারের সামনে টিকিট পাঞ্চ করিয়া দেবে / সবুজ রঙের টিকিট দেবে চার পয়সা পেলে / হলদে টিকিট দিও যদি তিন পয়সা মেলে।' বাকিটা মনে নেই। এর কেমন একটা ঘুমপাড়ানি সুর ছিল। সর্বত্রই শেষ পর্যন্ত আমাদের রবীন্দ্রনাথে না গিয়ে উপায় নেই—তাই মনে পড়ছে—

ট্রাম কনডাকটর
হুইসেলে ফুঁক দিয়ে শহরের বুক দিয়ে
গাড়ীটা চালায়, তার সীমা নেই জাঁকটার

তারপর সেই স্বপ্নাগ্য কবিতা—

রাস্তা চলেচে যত অজগর সাপ,
পিঠে তার ট্রামগাড়ী পড়ে ধুপধাপ।

ট্রামের ঘড়ঘড়ানি, কখনো মিষ্টি টুংটাং সেকেলে গল্পে খুব থাকত, আর সত্যি বাড়িতে বসেই সেই ঘন্টি শোনা যেত। বুদ্ধদেববাবু তিরিশের দশকে এক জায়গায় লিখেছিলেন কলকাতা শহরে দু'জন বি. এ. পাশ কনডাকটর আছেন। কি জানি তাঁদের কি তিনি চিনতেন? রাতের ট্রামে বাড়ি ফিরতে ময়দানের আলো কী যে সুন্দর দেখাত! অধ্যাপক অশোক মিত্র তাঁর 'তিন কুড়ি দশ', দ্বিতীয় খণ্ডে, স্বাধীনতা দিবসে জনতার উল্লাসের একটি ফটো দিয়েছেন—সর্বাঙ্গে যাত্রী বোঝাই একটি ট্রাম—যা দেখলেও আহ্লাদ হয়। ট্রামকে ভালোবাসেনি—এমন সাহিত্যিক কম। বঙ্গবাসীর ইন্দ্রনাথ বলেছিলেন—জানো কমলিনি—(যেমন কমলাকান্তের প্রসন্ন গোয়ালিনী) জগতের মস্ত দুঃখ তিনটি—পয়লা ট্রামগাড়িতে ভাড়া চায়, দোসরা স্বামী আবার আপিস যায়, তেসরা ইলিশমাছে কাঁটা হয়। ষাট-সত্তর বছর আগে কলকাতার সেকেণ্ড সিটির গৌরব ছিল পাঁচটি—ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, রেসকোর্স, টেলিফোন, ট্রামগাড়ি আর মোহনবাগান ক্লাব। এসবের ছড়া সংগ্রহ শ্রীযুক্ত তুষারকান্তি ঘোষ মশায়ের অতিবিচিত্র সংগ্রহে থাকা সম্ভব। ম্যাচ ফ্যাক্টরি তাদের কুপনে এই পাঁচটিই ছাপিয়েছিল। তুচ্ছ দেশলাই লেবেল যাঁরা ফেলে দেননি তাঁদের সংগ্রহে এই পঞ্চ গৌরব অবশ্যই আছে। ট্রাম, পেট্রল কিংবা ডিজেলে চলে না, বিদেশ থেকে আমদানির সমস্যা নেই, দেশের বিদ্যুৎ খরচ কম। বাতাস বিষাক্ত করে না, পরিবেশ দূষণ হবে না, বরং পরিবেশ ভূষণই হবে, তবু আমাদের সরকার বাহাদুর কেন কি নজরে দেখে তার ওপর মরণবাণ হানতে যাচ্ছে, তা আমাদের মতো অল্পবুদ্ধি আনপড় লোকের বুদ্ধির অগম্য।

গন্ধতেল ও অকুলীন পুরস্কার

কুন্তলীন পুরস্কারগুলো চোখে না দেখলেও, শিক্ষিত বাঙালি মাত্রেই তার নাম শুনেছেন।

হেমেন্দ্রমোহন বসু গল্পলেখকদের যে পুরস্কার দিতেন, তাতে তাঁর ব্যবসার প্রচার অবশ্যই হতো, কিন্তু আজ থেকে ঠিক নব্বুই বছর আগে তিনি যে কী করে অতগুলো (আট থেকে দশটি) অর্থ পুরস্কার দিয়ে গন্ধদ্রব্যের ক্রেতাদের বইগুলো বিনামূল্যে দিতেন, তা ভাবলে তাজ্জব বনে যেতে হয়। আসলে রাসায়নিক ও শিল্পী হয়েও তিনি মূলত অসাধারণ সাহিত্যপ্রেমিক ছিলেন। প্রথম পুরস্কার বেরুল ১৩০৩ সালে, শেষ খণ্ড ১৩৩৭ সালে। আচার্য জগদীশচন্দ্র থেকে শুরু করে শেষ খণ্ডে এসেছেন পরশুরাম। মাঝখানে কে না এসেছেন—রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, দীনেন্দ্রকুমার রায়, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, মণীন্দ্রলাল বসু, নরেন্দ্র দেব, প্রবোধ সান্যাল, শৈলজানন্দ, অচিন্ত্যকুমার। এঁদের উপহার দেওয়ার জন্যে সিল্কে মোড়া ফিকে রঙিন রিবনে বাঁধা কাসকেটটি ছিল নজরে পড়বার মতো, তা থেকে একটি ছোট টিকিট ঝুলত পদ্যলেখা—'কেশে মাখো কুন্তলীন, অঙ্গবাসে দেলখোস / পানে খাও তাম্বুলীন, ধন্য হোক এইচ বোস।' বিশের দশকের পর, তিরিশ আসতেই দেখা গেল প্রত্যেক বিয়েবাড়িতেই মেয়ে বা বউ দুটি-একটি কাসকেট পাচ্ছেন। ঘুমপাড়ানি ছড়ার মতো ছোট মেয়েরা এই কুন্তলবাহারের পদ্য আবৃত্তি করত। রাওয়ালপিণ্ডি থেকে শ্রীহট্ট, বরোদা থেকে ভাগলপুর, নেপাল থেকে সম্বলপুর—সর্বত্র বাঙালি যেখানে যেত, সঙ্গে থাকত কুন্তলীন তেলের শিশি, তাতেই সমুদ্রের ঢেউ থেকে সংসারের ঝামেলা সব থেমে যেত।

এই কুন্তলীন তেলের অসাধারণ সাফল্য অন্য বহু ব্যবসায়ীকে অনুপ্রাণিত করে, তাই তাঁরাও পুরস্কার দিতে থাকেন। কিন্তু হেমেন্দ্রমোহনের সাহিত্যরুচি, প্রতিভা ও আভিজাত্যের কিছুই তাঁদের ছিল না, তাই সেইসব পুরস্কার রক্ষিত বা আলোচিত হয়নি। তবু গন্ধ ফুলের পাশে ঘাসের ফুলেরও যেমন একটা ঠাঁই আছে, সে কথা মনে রেখে ভুলে যাওয়া ওইসব বই নিয়ে এখন বলতে যাচ্ছি—এ কোনো গবেষণা নয়, আবিষ্কার নয়, কলেজ স্ট্রিটের ফুটপাথ থেকে চার

ছ'আনা দিয়ে কেনা ছেঁড়া চটি সব বই। তবু এদের পোড়োভিটের খতেন (খতিয়ান) বা দাগ নম্বর বলা যেতে পারে বৈকি। কুন্তলীনের সঙ্গী যেমন দেলখোস, এইসব গন্ধতেলের সঙ্গেও থাকত গন্ধসার বা তখনকার ভাষায় এসেন্স বা সেণ্ট। তাদের কথাও একটু-আধটু বলব।

কুন্তলীনের অনুকরণে বই ছাপিয়ে উপহার দিতে শুরু করে কেশরঞ্জন তেল। মালিক কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, ঠিকানা লোয়ার চিৎপুর রোড। নববিধান ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র 'প্রকৃতি' মাসিক পত্রিকায় প্রতি মাসে কেশরঞ্জনের পাতা-জোড়া বিজ্ঞাপন থাকত। আকাশের ফালি চাঁদের ওপর একটি হৃষ্টপুষ্ট বাঙালি মেয়ে বসে, তার লম্বা চুলগুলো ঝুলে পৃথিবীতে এসে পড়ছে। কেশরঞ্জন প্রতি বছর উপহার দিত কিনা বলতে পারি না, হয়ত দিত। তার দেওয়া পুরস্কারের যে-কটি বই দেখেছি তা হল: সোনার কমল (১৩১২), উইল চুরি (১৩১৭), ঋণ পরিশোধ (১৩৩১), দেবতার দান (১৩৩৩), রাধারানী ১৩৩৫ সাল। কুন্তলীনের শেষ সংখ্যা বেরোয় ১৩৩৭ সালে। কেশরঞ্জন দেখেছি অন্তত ১৩৩৫ পর্যন্ত চলেছিল। প্রখ্যাত সংগ্রাহক মাননীয় তুষারকান্তি ঘোষ মশায়ের সংগ্রহে নাকি পঞ্চাশখানা কেশরঞ্জন পুরস্কার বা 'সামাজিক উপন্যাস' রাখা আছে। এই বিজ্ঞাপনটা পাচ্ছি হরিসাধন মুখোপাধ্যায়ের 'কলিকাতা সেকালের ও একালের' বইটার তৃতীয়, পরিমার্জিত, পি এম বাগচির ১৯৮৫ সংস্করণে। হরিসাধন মুখোপাধ্যায় মোগল-পাঠানের হারেম কাহিনী নিয়ে রগরগে উপন্যাস লিখতেন, এ কথা সকলেই জানি। কেশরঞ্জনের ওই হালকা গেরস্থালি বড় গল্পগুলো কি হরিসাধন মুখুজ্যের লেখা? পুরস্কারগুলোর কোনোটাতেই লেখকের নাম থাকত না।

কেশরঞ্জনের পাশাপাশি ছিল চিৎপুরেই এস. পি. সেনের ফ্যাক্টরি. তাঁদের 'স্বর্মা' তেল ছিল বেশ নামী। তার বড় শিশির দাম বারো আনা, অর্ধ আনা অর্থাৎ দু' পয়সার ডাকটিকিট দিলে সেণ্টের নমুনা মিলত। সেণ্টের নাম শুনে যান একে-একে: সাবিত্রী, রজনীগন্ধা, মিলন, রেণুকা, গন্ধরাজ, পারিজাত, মাস্ক, জেসমিন, হোয়াইট রোজ। হোয়াইট রোজ বিখ্যাত সেণ্ট। তখন ধবধবে ফরসা মেয়েদের দেখেছি 'হোয়াইট রোজ' নাম, আর হোটু বলে তাদের ডাকা হতো। কাশ্মীর কুসুমে নাকি সত্যি জাফরান থাকত। আরও একটি পুরস্কার দিত কর্নওয়ালিশ স্ট্রিটের কুণ্ডু অ্যাণ্ড চ্যাটার্জি। শুনুন এদের সুগন্ধের ফিরিস্তি: এসেন্স অফ মহারাজা বকুল, কাশ্মীর ফ্লাওয়ার্স, মহারাজ দিলদরিয়া, বকুল আর রোজ

পমেটম। এরাও আধ আনার ডাকটিকিট পাঠালে ভালো নমুনা দিত। চমৎকার আরেকটি রক্তবর্ণ তেল ছিল জি. ঘোষের তিল তেল। বড় দামি বোতল কিনলে তারা একটি লাল টুকটুকে গণেশের ছবি উপহার দিত। এদের সুন্দর ছবিটি এখনও ঘরে আছে, তবে নাম-ঠিকানা মনে নেই।

কেশরঞ্জন ছেড়ে চলে আসি লক্ষ্মীবিলাস তেলে। তাদের বোতলে আঁকা থাকত ধনুর্বাণধারী শ্রীরামচন্দ্রের মূর্তি। ওদের ব্যবসাও খুব চালু ছিল। কতগুলি বা কতবছর উপহার দিয়েছিল জানা নেই। আমাদের কাছে একখানাই মাত্র উপহারগ্রন্থ আছে, তার নাম 'গানোরের রানী'। সাল-তারিখ কিছু দেওয়া নেই। 'তুলে ধরতে গলে পড়ে' সেই অবস্থা। গল্পটাকে যথাসাধ্য রোমাঞ্চকর করার চেষ্টা হয়েছে। একটু শুনুন কোনো বেয়াড়া প্রশ্ন না করে।

বিন্ধ্যাচল পাহাড়ের মধ্যে গানোর দুর্গ। তাকে ঘিরে অঞ্জনা নদী। রাজা বিজয় সিংহ সম্ভবত পাঠানের সঙ্গে যুদ্ধে মারা গেছেন : তাই তাঁর রানী বীরাঙ্গনা পদ্মাবতীর প্রতিজ্ঞা, দুর্গ ধ্বংস করে তবে আত্মবিসর্জন দেবেন। এদিকে রূপসী রানীকে দেখে পাঠান সেনাপতি মুগ্ধ হতেই, রানী নিজে থেকেই বিয়ের প্রস্তাব জানালেন, তাঁর কোন্ ব্রত ছিল—সেটি উদ্‌যাপিত হলেই বিবাহ। রানীর ব্যবহারে পাঠানের সৈন্যেরা মুগ্ধ। তাদের দিয়েই পদ্মাবতী দূরের এক পাহাড় থেকে জমা করা রাশিরাশি ময়দার বস্তা আনাতে লাগলেন, বিয়ের উৎসবে লুচি ভাজা হবে তাই। রানীর কৌশলে তারা এত মুগ্ধ যে, বারুদের গন্ধ টের পেল না। আলিমদ্দী খাঁ আর রানীর বিয়ের সাজ সম্পূর্ণ, হঠাৎ বারুদের বস্তায় আগুন পড়ল। বিকট শব্দ করে পাহাড়ের চুড়ো সব ধসে যেতে লাগল আর রানী তাতে ঝাঁপ দিলেন। এমন গল্প কখনও শুনেছেন ? শোনার পর বলুন—'লক্ষ্মীবিলাসের তেল কিনিয়া সাদরে / প্রীতি উপহার দাও গৃহলক্ষ্মী করে।'

এরপর আমরা দেখছি ; দেলবাহার তেলের ছোট্ট বই। প্রকাশক শেখ ফসিউল্লা। এও চীনেবাজারি বই, বেরিয়েছিল ১৯০৪ সালে। বিজ্ঞাপনে আছে ; শেখের দোকানের সবই ভালো জিনিস, চার আনা দিয়ে এক শিশি গোলাপ নির্যাস যিনি কিনবেন, তা দিয়ে বড় এক বোতল ভালো গোলাপজল হবে। এক শিশি দেলবাহার তেল কিংবা দু'শিশি গোলাপ নির্যাস যিনি কিনবেন. তাঁকেই প্রকাশক একখানা গল্পপুস্তক বা উপন্যাস দেবেন। উপহারের বইটার নাম 'রায় পরিবার'। এই 'সামাজিক উপন্যাসে'র লেখক যোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। গল্পের শেষে বিয়েবাড়িতে সবাই ঠাণ্ডা জল খেয়ে সুখ্যেৎ করছেন। বিয়েবাড়ির

ক্যাওড়া থেকে বহু জিনিসই শেখের দোকানের। বরকর্তা নিমন্ত্রিতদের বলছেন, 'ফসিউল্লা মুসলমান হইলেও অতি ধার্মিক এবং ভদ্রলোক। তাহার দোকানে কেহ কখনও প্রতারিত হয় নাই।' ফসিউল্লা বলেছেন পরের বছর 'সোহাগিনী' নাম দিয়ে বড় উপন্যাস (দুশো পাতার) উপহার দেবেন। এই সোহাগিনীকে আমরা দেখিনি।

এরপর যে সুগন্ধি তেলের কারবারি উপহার বিলি করেছে, তার নাম 'বেগমবাহার'। এটি যেন পুরো কুন্তলীন। প্রথম বর্ষ ১৩১৮ সালের সুন্দর বইখানা সম্বন্ধে ভালো করে বলতে চাই। পড়লে অনেকেই অবাক হবেন।

প্রকাশক মসিহর রহমান। 'কয়েকজন কৃতবিদ্য হিন্দু ও মুসলমান সাহিত্যসেবী এক হইয়া গল্পগুলি নির্বাচন করিয়া দিয়াছেন। অন্য সম্প্রদায়ের মনে আঘাত লাগিতে পারে এরূপ গল্প আমরা ভাল হইলেও বাদ দিয়াছি।' আশি বছর আগে প্রকাশকের মুখে এসব কথা শুনতে ভালো লাগে বৈকি। কুন্তলীন যেমন প্রতি গল্পে লেখকের নাম-ঠিকানা দিত, এখানেও তাই। কুন্তলীনে যেমন বইয়ের শেষে বিজ্ঞাপন নিজেদের তেলের, এখানেও তাই। প্রকাশকের ইউনানী ওষুধের চালু দোকান ছিল বলে মনে হয়। কেননা হাসিয়ায় (মার্জিনে) সর্বত্র নানারকম মালিশ, তেল, সালসা, বটিকা, চূরণ, হালুয়া, চাটনি—এ সমস্তের বত্রিশটা নাম পাচ্ছি। এদের সূচীপত্র আর নামধাম পুরো তুলে দিচ্ছি—পাঠক যেন বিরক্ত হবেন না। কেননা এ বই পাওয়ার সম্ভাবনা কম।

বেগমবাহার তেলের উপহারসূচি : মসিহর রহমান প্রকাশিত, ১৩১৮ সাল।

গল্পের নাম ও লেখকের নাম ও ঠিকানা

১। বন্দিনী * শ্রীমতী লতিকা দেবী। বাবু নরনাথ মুখার্জি মুনসেফের বাড়ি, খুলনা জেলা, বাগেরহাট।

২। মিলন * শ্রীভূপেন্দ্রমোহন সেন। ধুবড়ি, পোঃ গোয়ালপাড়া, জেলা : আসাম।

৩। ওমরু * শ্রীমতী কিরণবালা দেবী। ৮, বলরাম বসু ঘাট রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা।

৪। পুরাতন শিশি * শ্রীহেমচন্দ্র বক্সি। পোঃ ধলা, ময়মনসিংহ।

৫। ভিখারি * শ্রীসন্তোষকুমার গঙ্গোপাধ্যায়। ৭১ / ১ সুকিয়া স্ট্রিট, কলিকাতা।

৬। ওয়াচমেকারের বিপদ * শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ মজুমদার। নেত্রকোণা পোঃ, জেলা : ময়মনসিংহ।

৭। জুলেখা * শ্রীতাহের উল্লা সরকার। পোঃ নওগাঁ, রাজশাহী।

৮। ফেরিওয়ালা * শ্রীরমণীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়।—ঠিকানা দেওয়া নেই।

৯। সন্ধ্যা * শ্রীমহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। ৩২, মহিম হালদার স্ট্রিট, কালীঘাট, কলিকাতা।

১০। চোখের দেখা * শ্রীযোগেন্দ্রনাথ রায়। অধ্যাপক এম. রায়ের বাড়ি। পোঃ খাগড়া, মুর্শিদাবাদ।

১১। এরপর আছে পনেরটি সুন্দর ছড়া, পৃষ্ঠাসংখ্যা মোট (১৬৬) একশ ছেষট্টি।

সব সেরা গল্প হল "ওয়াচমেকারের বিপদ"। অন্নদাপ্রসাদ অন্যত্র আরও গল্প লিখে থাকলেও তা জানা নেই।

"সন্ধ্যা" গল্পের ব্রাহ্মণ লেখক চিত্রিত করেছেন যে, কোনো পুরোহিত ব্রাহ্মণের গোঁড়ামিতে তাঁর ছেলের ঘনিষ্ঠ বন্ধু কাসেম জ্বর-বিকারে মারা গেল। গল্পটি সামান্য হয়েও বিষয়মূল্যে অসামান্য।

'জবাকুসুম' তেল আজ তিন পুরুষ ধরে চালু রয়েছে। তেলের সেরা তেল। বাংলা দেশের বহু জমিদার এবং গৃহস্থবাড়িতে বিগ্রহকে এখনও জবাকুসুমের সেবা দেওয়া হয়। এরা বই উপহার দিয়েছে নিশ্চয়, কিন্তু বর্তমান কমার্শিয়াল ম্যানেজারের তা জানা নেই। তবে কার কাছে পাব ওদের বই!

ম্যানেজার বললেন, ১৯৬০-৬৫ পর্যন্ত আমাদের সমস্তরকম তেল, শ্যাম্পু ও বিউটি লোশন আমরা বড় বড় পুজোমণ্ডপে ডালি সাজিয়ে উপহার পাঠিয়েছি। তাছাড়া, সিনেমা-থিয়েটারের প্রথম প্রদর্শনীতে আর মেয়েদের স্কুল ও কলেজে। এঁদের 'বসন্ত মালতী' উপহার দেওয়া আমরা দেখেছি। সেদিনের দু'টাকার শিশির দাম এখন বাষট্টি টাকা কি আরও বেশি!

বেঙ্গল কেমিকেলের তেল আর প্রসাধনের জিনিসের কোনো তালিকা নিশ্চয় আছে, কিন্তু সেটা বর্তমানে আমার নেই। ওদের তিনটি সেন্ট ছিল : পম্পা, শম্পা আর নিলিম্পা। রাজশেখর বসু হয়ত জানতেন, কে নামকরণ করেন এমন সুন্দর। ক্যালকাটা কেমিকেল অনেক ছোট, তবু তাদের কাছে গিয়ে নিজের কলেজের ছাত্রীদের জন্যে উপহার আদায় করতেন উইমেন্স কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ ড. ধীরেন্দ্রলাল দে। ১৯৫৭ সালেও তারা প্রত্যেক ছাত্রীকে উপহারের

প্যাকেট দিয়েছে নিম টুথপেস্ট, মার্গো সাবান আর কান্তা সেন্ট। নরেন্দ্র দেব এদের নাম দিতেন। এই দুই কুলীন প্রতিষ্ঠানেরই ক্যাস্থারাইডিন তেল বিখ্যাত ছিল।

এবার বেগমবাহার শাড়ির মতোই মোলায়েম আর হালকা দু-চারটি ছড়া শোনাই—

খোকা যখন কাঁদে মেঘে জমাট বাঁধে,
খোকা যখন হাসে আকাশে চাঁদ ভাসে।
খোকা যখন নায়
বেগমবাহার তেলের বা' হাওয়ায় ছড়ায় ॥১॥

খোখীর দোব বে/নবাব মহলে
খোখী হবে বেগম সাহেব/বাঁদী সকলে/
সোনার খাটে থাকবে শুয়ে রুপোর মহলে/
শতেক দাসী চুল বাঁধবে বেগমবাহার তেলে ॥২॥

খোখী মোদের সোনা/রাঙা চাঁদের কোণা,
আদা দিয়ে মুগের ডাল/ঘন দুধের ছানা
খোখীর মাথায় দেব বেগমবাহার
কেউ কোরো না মানা ॥৩॥

খোখীর নাক বলে খাঁদা
বরটর আসবে নাকো বলে গেল দাদা।
খোখীর মা ভয় কোরো না—বেগমবাহার তেলে
এমন খোঁপা বেঁধে দিব—বরটি যাবে ভুলে ॥৪॥

আয়রে আয় দিদিমণি/ঘুমপাড়ানী ঘুমের রানী
বসে পড় খোখীর চোখে/সোনার আসন পেড়ে।
খোখী মোদের ঘুমায় যদি/দেব তোমায় তোষক গদি
দুধের বাটি ভাতের থাল/সোনা দিয়ে গড়ে
মসিহরের 'বেগমবাহার' / দেব শিশি ভরে ॥৫॥

কলকাতার কলের গান ও টকিং মেশিন

আমি একটু বেশি পুরোনো, মানে একশো বছর আগের থিয়েটারী গান নিয়ে দু'কথা বলতে এসেছি। নির্বাক ছবিতে তো গান থাকতে পারে না, সবাক বা টকী হল তো ১৯৩১-৩২-এ।

টকীর যুগে পুরোনো গ্রামোফোন রেকর্ড সংগ্রহ অনুমান করছি কলকাতা শহরে বহুলোকেরই আছে। দোকান থেকে বইয়ের তালিকার মতো সেকালে রেকর্ডের তালিকাও বের হতো। তাদের কিছু কথা বলি। চোঙ্‌দার প্রকাণ্ড গ্রামো-ফোনের পাশে সেজেগুজে ঘড়ির চেন ঝুলিয়ে, মাটিতে চাদর লুটিয়ে, মখমলের কুশনের ওপর পা রেখে স্টার থিয়েটারের কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায় জমিদারবাবু সেজে ছবি তুলিয়েছিলেন। সচিত্র ওডিয়ন গীতাবলীতে হরিশ্চন্দ্র রাজার সঙ্গে রানী শৈব্যার শ্মশানে আলাপ নিয়ে পালা ছিল, অমরেন্দ্রনাথ দত্তের গোবিন্দলাল, আর কুসুমকুমারীর রোহিণীর পালা ফাজিল ছেলেরা অনেকে মুখস্থ করে টেনে-টেনে আবৃত্তি করত। পান্নাময়ী দাসীর কীর্তন তখন বেশ নাম করেছিল—'কানু কহে রাই কহিতে ডরাই ধবলী চরাই মুই রাখালিয়া মতি, না জানি পিরীতি রসের পশরা তুই।' এই গানটা ছোটবড় সকলেরই শোনবার অধিকার ছিল। বড়দের আড্ডাঘরে তো ছোটরা ঢুকতে পায় না, কিন্তু গলির জানলার খড়খড়ি সামান্য উঁচু করলেই শোনা যেত—'মায়াবিনি, আমি তব ধাইব পশ্চাতে, সাথে লয়ে তপ্ত আঁখিজল, তুমি কিন্তু চলে যাবে ফিরায়ে বদন বরষিয়া বিদ্রূপের হাসি।'

তখনকার রেকর্ডের গায়িকাদের নাম শুনুন দু'চারজনের: বেদানাবালা, ডালিমমণি, মালতীমালা, সুশীলাসুন্দরী, নরীসুন্দরী, উষাবালা, এইসব। এছাড়া সেকালে একটি মুসলমান ছেলের ছিল অতি সুকণ্ঠ, তিনি শ্যামা শ্যাম দুই সঙ্গীতই গাইতেন, তখন তিনি ছিলেন খ্যাতির তুঙ্গে, রেকর্ড করবার সময় 'কে. মল্লিক' ছদ্মনামে তাঁর অসংখ্য রেকর্ড করানো হতো। এঁরই জীবনের বিচিত্র কথা নিয়ে প্রখ্যাত লেখক গোলাম কুদ্দ‍ুস 'সুরের আগুন' উপন্যাস লিখেছিলেন।

কে. মল্লিকের গাওয়া একটি ছোট গান তুলে দিই—

হল মা দিবা অবসান। কিঞ্চিৎ বিলম্ব আছে মুদিতে নয়ান।

শুনগো মা ভবতারা, অজপা হইল সারা,

কৃপা করে দে মা তারা ও চরণে স্থান ॥

বসুমতী থেকে রাগরাগিণীর ছবি অমৃতলাল বসুর মস্ত ভূমিকা আর প্রচলিত প্রায় সব গান দিয়ে 'বীণার ঝঙ্কার' নামে ছোট অভিধানের মতো এক বই বেরিয়েছিল। কার-মহলানবিশের দোকান থেকে কাপড়ে বাঁধাই সাড়ে সাতশো গানের সংগ্রহ।

বঙ্কিমের 'কপালকুণ্ডলা' ভেঙে যাত্রাপালা হয়েছিল, নবকুমার আর মতিবিবি সংবাদ তাতেই ছিল। অভিমন্যু-উত্তরা পালা ছিল কাদের তা মনে নেই। চোঙ্‌দার গ্রামোফোন উঠে গিয়ে হিজ মাস্টারস্‌ ভয়েস বা এইচ এম ভি রেকর্ড হল, শুনেছি দমদমের বাগানে রেকর্ডিং হতো। ঝরিয়ার খনি অঞ্চলের কমলা-দাসীর নাম হল কমলা ঝরিয়া। 'যমুনে, এই কি তুমি সেই যমুনা প্রবাহিনী'— গানটি সারা শহরে সর্বত্র জনপ্রিয় হয়েছিল। আঙুরবালা ইন্দুবালা আশ্চর্যময়ী পান্নাময়ীরা প্রায়শ চিৎপুর অঞ্চলের বাসিন্দা ছিলেন। ভদ্রঘরের মেয়েরা ঠিক কবে প্রথম গান রেকর্ড করালেন তা বলতে পারছি না।

চোঙ্‌দার গ্রামোফোনের ছবি রেকর্ড সঙ্গীতের মলাটে আছে। কার অ্যাণ্ড মহলানবিশ ১-২ চৌরঙ্গী রোড, ওডিয়ন মেশিনের দাম লিখেছেন নব্বই টাকা, ক্যাটালগের গায়ে তারিখ ১৯০৮ সাল।

কলকাতার ফেরিওয়ালার ওপরে এখানে একটি 'সরস' গান আছে। (রেকর্ড নম্বর ১১৪-৯৪৪৬০)।

> ঐ পয়সা উড়ে যায়।
> এ সহর কোলকেতায় কত আজগুবি বিকায়,
> ছলে, বলে, কলাকৌশলে পয়সা উড়ে যায় ॥
> ফেরিওয়ালার দল যত, কানের কাছে অবিরত
> যে যার বুলি ডেকে যায়।
> ওগো রকম রকম তাদের সুর বড়ই মজার বড়ই মধুর
> শুনিয়া কার জিহ্বা না জলে ভিজে যায়
> নাকে মুখে তিলক কেটে পাহাড় প্রমাণ বোঁচকা পিঠে,
> 'এক টাকায় চারখানা কাপড়, একখানা ফাউ'
> ওগো মোটা সোটা খোট্টা ভায়া হিন্দিতে চেঁচায়
> কখন কখন শুনি, রমণীর মধুর ধ্বনি,

দাঁতের পোকা বার করি, কোমরের বেদনা আরাম করি

বাত ভাল করি আয়।

দুপুরবেলায় ঘুরে ঘুরে মাথায় ঝুড়ি বৃদ্ধ মিঞা

গম্ভীর স্বরে সে হাঁকে চুড়ি চাই বালা চাই আয়

চাই চানাচুর ঘুগনি দানা, চীনে বাদাম নকল দানা

অবাক জলপান কেহ বা চেঁচায়

সন্ধ্যাবেলা দেখি বেশ মালাই কুল্‌পি বরফ সরেস

বৈঠকখানায় বাবুদের লাগে ভাল তাই।

চাই বেলফুল বেলফুল ঘন ডাকে মালীকুল

একি জ্বালা দুপুর রাতে মন ভুলান ছড়া গেঁথে

জামাই তত্ব লেডিকেনি দেখতে কালকিঙ্কিন্ধ্যে,

ভাঙ্‌তে গেলে নানা রঙ্গে স্বাদ তার সঙ্গে সঙ্গে পায়॥

তারিখ ১৯০৮

শ্রীযুক্ত রাধাপ্রসাদ গুপ্ত মশাই 'কলকাতার ফিরিওয়ালার ডাক আর রাস্তার আওয়াজ' নিয়ে যে অপূর্ব বইখানি লিখেছেন, তার ১ম সংস্করণের তারিখ ১৩৯০ (১৯৮৪), রেকর্ড সঙ্গীতটি তাহলে প্রায় তার পঁচাত্তর বছর আগে লেখা। কোনো-মতে এখানে তুলে দিলুম তা থেকে দু'তিনটি গান। আমার সব লেখাই স্মৃতি-নির্ভর, বই হাতের কাছে পাইনে, অগুনতি ভুল থাকে। মাথার মধ্যে ছবিগুলি সব ওলোট-পালোট। পাঠক শুধরে নেবেন।

জয় জয় সম্রাট ৫ম জর্জ নামে (রেঃ কাঃ, পৃঃ ২১)

বাঁটের মুখে খাঁটি দুধ (পৃঃ ১৬)

গিরিশ ঘোষ রচিত

বিঘোরে বিহারে এক্কা চড়িনু (পৃঃ ৯৫)

ওগো তারেই বলে প্রেম (পৃঃ ৯১)

D. L. Roy

প্রথম যখন বিয়ে হল (পৃঃ ১১)

দুটো মজাদার গান শুনুন—

১. সুখ নাই আর উকিল মহলে

ওকালতির প্যাঁচ লেগেচে উকিলের গোলে

কোর্টে নাইকো মিছিল মামলা ভাবচে বসে যত আমলা
উকিলেরা বেচ্‌চে সামলা কিসে দিন চলে।
এ-কাজে আর নাইকো জুত জুটেচে অনেক ভূত
হয়েচে ঘোর বেজুত কাঁদচে সকলে।
আগে ছিল প্রচুর আয় এখন পেট চলা দায়
কৃষ্ণকিশোর রমাপ্রসাদ রায়ের আমলে।
হরিঘোষের গোয়াল গোয়াল যেমন
হাইকোর্টের লাইব্রেরি তেমন
কেউ ঢুকচে কেউ বেরুচ্চে নজীর বগলে
হাইকোর্ট সামলাময় উকিল সংখ্যা সহজ নয়
দলে দলে পালে পালে বেড়াচ্চে হলে।
যাদের না অন্ন জোটে সাইনিং নাইকো কোর্টে
ঢুকচে সব জেলা কোর্টে বোম্বেটের দলে।
যাদের পসার হয়ে গেছে আয় তাঁদের সমান আছে
তাদের নেই হাজা সুখা বারো মাস চলে।
কি দুর্দশা কব কার কেউ হচ্চে বাপদাদার
পক্ষে বিপক্ষে মেলা গুজার
বাসা খরচ চলা ভার, কবিরত্ন বলে ॥
এই গান গেয়েছিলেন মন্মথনাথ রায়, যাঁর কোনো পরিচয় জানা নেই।

২. খাজা খুর্মা খাসা মণ্ডা—
এ যে বড় ফলার চেগেছে নিতাই
যখন দ'য়ের আগে মণ্ডা ভাঙি
যেমন বানের আগে জেলে ডিঙি
লুচি আর মিঠে গজা, তার উপর পাঁপর-ভাজা
দে দৈ দে দৈ পাতে ওরে বেটা হাঁড়ি হাতে
বেটা পরিবেশনের কিছু জানে না।
ওদের পাতে দু'বার দিলি
আমার পাতে ভুলে গেলি
ওদিকে যে টান বড়ো

ওরা কি তোর বাবা-খুড়ো
আমরা কি কেউ নই রে

এর নাম কীর্তন, সুর খেমটা।

মিস্ গহরজান
তাল—দাদরা

আজ কেন বধূ অধর কোণেতে
শুকালো হাসির রেখা।
পরাণের হাসি, চুরি কে করেছে
বল গো পরাণ-সখা ॥
কেন শূন্য আঁখি নেহারি,
ব্যাকুল চাহনি সব কি দিয়েছ
যা ছিল সরমে মাখা।

মাল্কা জান
ঝিঁঝিট খাম্বাজ—পোস্তা।

আমার এ সাধের তরী প্রেমিক বিনা নিই না কারে।
যে প্রেম জানে না চড়তে মানা, ডোবে তরী একটু ভারে।
মনে মনে বুঝে দেখ, এস যদি প্রেমিক থাক,
কে ধর প্রেম পসরা, এস ত্বরা নে যাই পারে।
প্রেম-তুফানে তরী ভাসে, দেখ্‌লে প্রেমিক তীরে আসে,
ঢেউ দেখে যে ভয় পাবে না, অকূল পারে নে যাই তারে ॥

(উৎস . অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সংকলিত 'রেকর্ড কাকলী', ২য় সংস্করণ, ১৩২৮)

থিয়েটার সংগীতের বইগুলিতে প্রায়ই তারিখ নেই, তবে বেশিরভাগ এই শতাব্দীর প্রথম দশকে ছাপা। 'রেকর্ড কাকলী', ১ম সংস্করণ আমরা দেখিনি। কলের গান, কার অ্যাণ্ড মহলানবিশ—চটি আর মোটা দুই সাইজ, সচিত্র ওডিয়ন গীতাবলী, বেকা গীতাবলী, বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের সুবৃহৎ বীণার ঝঙ্কার—এতে সব গানই পাওয়া যাবে।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আর অমৃতলাল বসু এঁদের গানই প্রধান।

'বিঘোরে বিহারে চড়িনু এক্কা' মজাদার গান—'এক্কাগাড়ি খুব ছুটেছে' হাসিখুশি'তে পড়লেও কজনই বা চড়েছিল ? গাইত সকলে। দ্বিজেন্দ্রলালকে দ্বিজু

রায় বা ডি. এল. রায় বলা হতো। 'প্রথম যখন বিয়ে হল' আর 'ওগো তাকেই বলে প্রেম'—এ দুটি গানের মতো সর্বজনপ্রিয় গান প্রায় ছিল না।

যখন থাকে না ফিউচারের ভয় থাকে নাকো 'শেম'।
ওগো তাকেই বলে প্রেম।

ডি. এল. রায়ের অতুলনীয় একটি গান দিয়ে আমার বকুনি শেষ করি :

তোমায় ভালবাসি বলে তুমি বুঝি মনে ভাব
যে তোমার চন্দ্রমুখ না দেখিলে মরে যাব ?
ঘুঘু চরবে আমার বাড়ি, উনুনে চড়বে না হাঁড়ি,
বৈদ্যেতে পাবে না নাড়ি—এমনি দশায় খাবি খাব।
তুমি যদি ভাল না বাসো ত আমার তবে বয়েই গেল।
ডাকলে তোমার পাইনে সাড়া, নেই কি কেউ তোমা ছাড়া
এই গোঁপজোড়াকে দিলে চাড়া তোমার মত অনেক পাব।

তখনকার দিনের কর্তারা এই শেষ চরণটি ঘুরেফিরে প্রাণের ফুর্তিতে খুব গাইতেন।

নামকরণ

সুন্দর মুখের মতোই সুন্দর নামের জয়ও সর্বত্র। আপনার বাড়ির নবজাতকের নাম চাই। মা বাপের নামের সঙ্গে মিল রেখে নতুন উজ্জ্বল অর্থবহ বর্ণধ্বনিময় নাম দরকার। ছেলে ক্লাসিকাল ভাষা না শিখুক দুঃখ নেই, নাম কিন্তু ঐদিক ঘেঁষেই দিতে হবে। তাই কিছুকাল ধরে আপনি ব্যস্ত, চিঠি লিখচেন, বই পড়চেন, টেলিফোন করচেন—সব নামের প্রত্যাশায়।

একে একে মনে আসচে—অভিজিৎ, ইন্দ্রসেন, অমিতায়ু, অনির্বাণ, সম্বরণ, সব্যসাচী, শতানীক, সত্যকাম, সৌমিত্র, নির্মাল্য, কৌশিক, রাহুল, শুভাঙ্ক, সঙ্কেত, আনন্দবর্ধন, রাজশেখর···নাঃ, এই 'ষোড়শ নাম' কোনো কাজেই এল না। আপনার আবার বড় বড় ঘরে যাতায়াত কিনা, তাই ওসব নাম কারও না কারও শুনেচেন। খুব ভাবনার কথা সন্দেহ নেই। ভগবান বুদ্ধের অমন শান্ত, সুন্দর নাম—অমিতাভ, দশবল, লোকনাথ, বিনায়ক, সুগত, তথাগত—এসব আজকাল আজেবাজে মামুলি লোকেরও দেখা যাচ্ছে। অভিজাত নামগুলোর জন্যে কেন যে কপিরাইট আইন নেই? একটা অভিধানও যদি থাকত শুধু অচলিত নামের, তাহলে আপনার জড়ো করা মাণ্ডবী, বাভ্রবী, সর্বঙ্কষা, শালঙ্কটা, একজটা, কুরুকুল্লা, হেরুক, মঞ্জুশ্রী—এগুলোর নামধাম পরিচয় একটু জেনে নিতেন। ছেলেমেয়েরা বড় হয়ে সারা পৃথিবী ঘুরবে, আধুনিক ছবি আঁকবে, ক্লাসিকাল গান গাইবে—আর তাদের যমুনাবতী, সরস্বতী নাম হবে এ তো সইতে পারা যায় না। সত্যি, নদীর নামের আর বাকীই বা কী আছে, এক ব্রহ্মপুত্র ছাড়া? এত যে লোকে প্রাচীন কাব্য বলতে গলে পড়চে, কিন্তু ও-বস্তু ব্যবহারে তো আসে না। চর্যাপদ থেকে লুইপা, হাড়িপা. ডাক, ডোম্বী এসব দিয়ে অপাঠ্য থিসিস লেখা চলতে পারে কিন্তু মানুষের নাম অত হেলাফেলা নয়। মঙ্গলকাব্যও তাই, সংখ্যায় অগুণতি, নাম বলতে এক ফুল্লরাই একটু ভদ্রস্থ, তবে কৌলীন্য নেই স্বীকার করাই ভালো।

সাতকাণ্ড রামায়ণের মধ্যে সত্যিকারের আধুনিক নাম বলতে এক সুগ্রীবের বৌ রুমা। কিন্তু ফিল্মের জ্বালায় ও-নাম যে এখন সেমি-লিটারেটদেরও মুখে মুখে। তাছাড়া ছেলেদের নতুন নাম কোথায় রামায়ণে? হনুমান জাম্বুবান

ছাড়া। বজরঙ্‌বলীর প্রতি বাঙালির ভক্তি বড়ই কম, তাই আঞ্জনেয় কি মারুতি রাখলেও ছেলে বড় হয়ে বদলে নেবে। ভাগবত ভাঙিয়ে বাঙালি খেয়ে আসচে তিন-চারশো বছর ধরে। এখন ওর প্রেস্টিজ কমে এসেচে, নইলে খাঁটি হরিনামামৃত ব্যাকরণ আপনার জন্যে পেড়ে আনতুম, যার সর্বাঙ্গে শুধুই কৃষ্ণনাম। তাহলে বাকী রইল শুধু অগতির গতি মহাভারত। সত্যি-সত্যি ওয়াণ্ডারফুল বই ও-খানা। জানেন, প্রায় লাখখানেক শ্লোক আছে। নাই-বা কেউ পড়ল (সময় কোথায় বলুন!), তবু ভক্তিশ্রদ্ধা সবাই করে। আধুনিক চল্‌তি বাঙলায় ওর এক অধমতারণ অনুবাদও আছে। দশ টাকা দামের বই, বিয়েতে খুব চলে। সেইটে নিয়ে একটা প্রেমগাথা সহ বিনিদ্র দুপুর যাপন করুন, নিশ্চয় হদিস পাবেন।

দেখুন, নিছক কাব্যের দিন আর নেই, দেশসুদ্ধ লোক লেখাপড়া শিখচে, এখন একটু পণ্ডিতি পছন্দ মানুষের। তাই যদি সূত্রকার, ভাষ্যকার, স্মার্ত, দার্শনিক এঁদের ভক্তি করেন তো বলুন—বোধায়ন, পরাশর, কণাদ, গৌতম, হারীত, গোভিল, পতঞ্জলি, মল্লিনাথ, মেধাতিথি, জীমূতবাহন, উদয়ন, গঙ্গেশ, অসঙ্গ, চার্বাক চলবে? আজকাল একটু উঁচু-ধাপের মানুষেরা জৈন নাম পছন্দ করচেন, তা জানেন। হবেই তো, বুদ্ধ বড় বেশি ডিমোক্র্যাটদের সঙ্গে ঝালেঝোলে মিশে গেচেন। সত্যি দেখুন, ইস্কুল-কলেজের প্রতি পঞ্চাশটি মেয়ের একটি, হয় গোপা, নয় যশোধরা। তাই এখন ত্রিশলা, বিদেহদত্তা, নন্দোত্তরা, চন্দনবালা—মন্দ কি? শ্রেয়াংস, যশাংস, নেমিনাথ, কুশলনাথ, পার্শ্ব, ঋষভ এ-সব নাম বন্ধুমহলে আপনার বৈদগ্ধ্য প্রচার করবে। পরিচিতমহলে ইতিহাস-প্রীতির জন্যে যদি অভিনন্দন পেতে চান, তাহলে—প্রসেনজিৎ, কনিষ্ক, স্কন্দ, রুদ্রদামন, আরো সব বাঘা বাঘা নাম রয়েচে। একটু উৎকট নাম চাইলে—চষ্টন, নহপান, হুবিষ্ক, বাসিষ্ক। এপিগ্রাফি-ঘেঁষা চাইলে—নাগনিকা, শ্যামায়িকা, মামল্ল, শাতকর্ণী, পুলমায়ী—মায়, ব্রাহ্মী-খরোষ্ঠীও রেখে দেখতে পারেন, বিদ্বোষ্ঠীদের আপত্তি নাও হতে পারে। হর্ষ পুরনো, নাম আপনাকে রাখতে হলে মৌর্য, কুষাণ, পুলকেশী কিংবা পুষ্যভূতি। 'চিরকুমার সভা'য় অক্ষয়ের শালিবাহন উপাধিটা খুব পছন্দসই ছিল, মনে আছে? অশোকের প্রতি ভক্তি থাকলে (ও-নাম রাখতে বলিনে, কিছুকাল বাদেই লোকে ভাববে হোটেলের নাম!) বিন্দুসার, সুভদ্রাঙ্গী, কারুবাকী যা ইচ্ছে রাখুন না কেন? 'সুভদ্রাঙ্গী' নামে একটা উপন্যাস ছিল ভাষাবিদ্ নলিনীমোহনের। ওই -নামের উল্লেখ পেয়েছিলুম তারাশঙ্করের কোনো এক ছোটগল্পে।

সেদিন এক বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে দুটি নাম শুনলুম—বসুধারা আর নান্দীমুখ।

এখন তৃতীয় মুখ দেখা দিলে ওরা নাম কি রাখবেন? বোধ হয় অন্নপ্রাশন। আগেকার দিনে নাম নিয়ে এত ঝামেলা ছিল না। বেশিরভাগ খুঁজত স্বপ্নময় কাব্যময় নাম : দশার্ণ, নির্বিন্ধ্যা, বিদিশা, বেত্রবতী উচ্চারণ করলেই ওরা তাদের 'সঘন সজল বিশাল মায়ায়' চিত্তকে আচ্ছন্ন করে ফেলত। মালবিকা শুনলেই মনে হতো বহুযুগের ওপার থেকে সে যেন অনিমিষে আপনার দিকে তাকিয়ে আছে। এখন 'হায়-রে হৃদয় তোমার সঞ্চয়'—সমস্ত নস্টালজিয়ার পালা শেষ।

তখন গেরস্তঘরে ছেলে জন্মালে গোপাল, গোবিন্দ, রামকৃষ্ণ, গৌরনিতাই, কানাই, বলাই, তুলসী, যশোদা যা হয় রাখা হতো। মেয়েদের জন্যে স্বয়ং রাধারাণী ললিতা বিশাখাদি অষ্টসখী নিয়ে ঘরে ঘরে তৈরি থাকতেন। বিদগ্ধমাধব কিংবা কবিকর্ণপূরের রস গড়িয়ে পড়া লবঙ্গলতিকাদেরও মাঝে-সাঝে দেখা যেত। শাক্ত-বাড়িতে নামের ব্যাপারে রসের বাহার কম ছিল—ভোলানাথ, শম্ভুনাথ, বিশ্বনাথ, বদ্যিনাথ, তারকনাথ, চন্দ্রনাথ, তারাচরণ, উমাচরণ, গুরুদাস, গঙ্গাপ্রসাদ। এইসব নাম নিয়েই ছেলেরা পুরুষানুক্রমে হাইকোর্টের জজিয়তি থেকে স্যাকরাবাড়ির হাতুড়ি ঠোকা পর্যন্ত করে যেত, যার কপালে যা জুটত।

নতুন নামের, উদ্ভট নামের হিড়িক উঠেচে তা তিরিশ-চল্লিশ বছর খুবই হবে। তার আগের যুগের বাঙালি মেয়েদের ছিল ফরসা রঙ্ নিয়ে অশোভন মাতামাতি। স্যার গুরুদাস সখেদে লিখেছেন, তাঁর এক বন্ধুপত্নী ভাবী পুত্রবধূ নির্বাচন করার সময় দ্বিধাহীন ভাষায় জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, পাত্রীর এক চোখ কানা হলেও চলবে কিন্তু গায়ের রঙ্ ময়লা হলে চলবে না। কালো মেয়েকে ঝামা ঘসে ফরসা করে নেওয়া যেত না, কিন্তু গেঁয়ো নামকে শহুরে করে নেওয়া যেত। তাই সে-যুগে মেয়েদের শ্বশুরবাড়ি যাবার পর হামেশাই নাম বদল হতো। সকলেই জানেন যে মহর্ষির কনিষ্ঠ পুত্রবধূ ঠাকুরবাড়িতে পা দেবার পর ভবতারিণী থেকে মৃণালিনীতে রূপান্তরিত হয়েছিলেন। প্রসঙ্গত বলি, মহর্ষি তাঁর বন্ধুপত্নীদের ভারী সুন্দর নামে উল্লেখ করতেন ('পত্রাবলী'তে পাবেন)। এ অবিশ্যি নাম-বদলের ব্যাপার নয়।

সে-যুগের কথাই যখন উঠল তখন স্মৃতির ভাঁড়ায় থেকে আরও কিছু খুঁজি। এসব নাম রাখা নাই-বা গেল, শুনতে তো দোষ নেই। প্রথমে শুনুন সাবেকী আমলের মেয়েদের আটপৌরে নাম—গিরি, সুরো, নেড়ি, গেঁড়ি, ক্ষেন্তী, বিন্তি, টুনি, বিনি, ফেলি, বেলি, আতর, গোলাপ, চাঁপা, টগর, আঙুর, বেদানা, সোনা, মোনা, হীরে, মুক্তো, চুনী, পান্না, গিনি, মোহর, আদর, আহ্লাদ, উত্তম, চমৎকার, ময়না, টিয়া, বিলেত, রেঙ্গুন, নিস্তার, পেসাদি ইত্যাদি। তারপর মাখন, বসন

(বসন্ত থেকে), রাসু, রাজু, জগু, নেত্য, পটল, নন্দ, পাঁচু, কুঞ্জ, সিধু, নিধু, ক্ষেত্তর, বিনোদ, শেতল, বাদল, রতন, মোতি, চাঁদ, মানিক—এসব নাম স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে অবাধে চলত। কলকাতা অঞ্চলের মানুষের মধ্যে তখন ডাকনামের কদর ছিল বেশি। পোশাকী নামকে ঠাট্টা করে একটা ছড়া ছিল :

অমুকের মা তমুকের মা
একটা কথা শুনসে।
হাটে গিয়েছিলেম শুনে এলেম
মানুষের নাম নরশে॥

বিন্দুবাসিনী থেকে বিন্দী, ক্ষীরোদবাসিনী থেকে ক্ষীরি/ক্ষীরো ('লক্ষ্মীর পরীক্ষা'), মোক্ষদা থেকে মুখী, পূর্ণকেশী থেকে পুনি (এই নাম রাখলে নাকি মাথায় চুল বাড়ত), আর-না-কালী থেকে আন্না-আনি, আনু এ-সবই ছিল খুব চলতি নাম। আমি এখনো চোখ বুঁজলে ওঁদের নাকে নথ, মুখে পান আর সিঁথেয় যতটা পতিভক্তি ততটা সিঁদুর পরা মুখগুলো দেখতে পাই।

সেকালের গল্পে, বিশেষ করে গিরিশচন্দ্র, শরৎচন্দ্র, জগদীশ গুপ্ত, সৌরীন মুখুজ্যের লেখায় এসব নামের মানুষ বিস্তর। প্রেমাঙ্কুরের অনুমতি আর ফাদার নিস্তারকে, জাহাজের টগর বষ্টুমীকে আর তারাশঙ্করের বসনকে ('কবি') কী ভোলা যায়? দুটি কিঞ্চিৎ বিরল নাম বাতাসী আর পাতাসী। বাতাসী নাম সব মেয়েরই রাখা চলে কিন্তু পাতাসীকে হতে হবে লম্বা ছিপ্‌ছিপে আর ফরসা (এ ব্যাখ্যা এক সেকেলে গিন্নির মুখে শোনা)। বাতাসীকে পেয়েছি সুরেশ সমাজপতির গল্পে, পাতাসীদের ভিটে দেখেচি এক গ্রামে।

এককড়ি, দু'কড়ি, তিনকড়ি, পাঁচকড়ি, সাতকড়ি, ন'কড়ি এরা সব নাকি হারা-মরা ছেলে। আঁতুড়ঘরে ধাইমা এদের কিনে নেওয়ায় যম আর নেয়নি। কড়ি দিয়ে কেনা ছেলেদের বাজারে ঐতিহাসিক ব্যতিক্রম হচ্চেন খ্যাতনামা অভিনেত্রী তিনকড়ি।

আমাদের আদুরে ছেলেদের ঘরোয়া নামও বিস্তর, দুটো-চারটে বলি—হাঁদা, খেঁদা, ভুঁড়ো, ভোঁদা, ন্যাড়া, বোঁচা, খোদন, পোঁটন, ছেনি, মেনি, নন্তু, মন্তু, ঘোতন, চৈতন, ছোটন, নোটন, নাচন, দোলন, জুড়ন, কুড়ন, গদাই, ভোম্বল, পটলা, গণ্‌শা, রস্কে, ফট্‌কে—একটু উঁচু থাকে—আশু, বিশু, কানু, ভানু, চারু, হারু, অনু, বেণু, যদু, মধু, শিবু, হাবু, শঙ্কু, বঙ্কু, নিমু, হিমু, সুকু, টুকু, মণ্টু, পিণ্টু ইত্যাদি।

পাঁচকড়ি সে যুগের সম্পাদক ও গদ্যলেখক। সাতকড়ি এ যুগের দার্শনিক এবং প্রগাঢ় পণ্ডিত। মণ্টু দ্বিজেন্দ্রলালের পুত্র দিলীপকুমার। ঘেনো না ঘোতন নাম নিয়ে এক বিভ্রাটের গল্প করেচেন শিবনাথ শাস্ত্রী। খোদন তো তাঁরই এক দৌহিত্র। জুড়ন ছিলেন কেমিস্ট এবং গল্পলেখক। নাচন হেমন্তবালার দৌহিত্র, রবীন্দ্রনাথের দেওয়া নাম ('পত্রাবলী ৯' দেখুন)। বিভূতি মুখোপাধ্যায়ের গল্পে শিবপুরের ঘোৎনা আর গণ্‌শাও আমাদের দেখা মানুষ। পোঁটন, পুঁটি, পুঁটে, পুঁটুরাণীর গল্প বাঙলা ভাষায় বিস্তর। দুই বোনকে বড় পুঁটি, ছোট পুঁটি বলে ডাকার রেওয়াজ শুধু গ্রাম অঞ্চলেই ছিল না, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের চিঠিপত্রে দেখুন বিলেত থেকে বড় পুঁটির খোঁজ নিচ্চেন। এই বড় পুঁটি হলেন কোচবিহারের মহারাণী স্থনীতি দেবী। তবেই দেখুন, এ-যুগের চুলবুলি, বুলবুলি, রুমকি, ঝুমকি, বাবলি, কাবলির তুলনায় এঁরা মোটেই খাটো নন। আসলে সে-যুগের জামাইবাবু, শালাবাবু, খুড়োবাবু, মামাবাবুর সঙ্গে মিছরিবাবু, মোহরবাবু, ছাতুবাবু, লাটুবাবু অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়ানো। ঐ-সব নামকে বাদ দিয়ে ঐ যুগকেও পুরো জানতে পারবেন না।

বিলিতি ফ্যাশানের নামের খুব চল ছিল কোনো কোনো বাড়িতে। আহা দিব্যি নামগুলি: মেরী, চেরী, লিলি, ডলি, মিনি, নিনি, বেবী, বিউটি, মিলি, বিবি। তারপর আইভিলতা, আইরিনবালা, কুইনপ্রভা, অ্যানিটা (যোগেন্দ্রনাথের 'গ্যারিবল্ডী'র পর থেকে), হেলেন, এমিলিরাণী, এলিজিস্থন্দরী (গ্রে'জ "এলিজি" নয়, এলিজাবেথ), জুবিলীপ্রস্থন, জর্জ, শেলি, (মেয়েদের নাম), মেরিগোল্ডহাসিনী-ডিউড্রপবাসিনী (শেষোক্ত নামদুটির সন্ধান দিয়েচেন অধ্যাপক ললিত বাঁড়ুজ্যে) ইত্যাদি। শখ থাকলে এঁদের কুলজী সংগ্রহ করলে ভারী চমৎকার বস্তু হবে।

ব্রাহ্মসমাজের প্রবল তরঙ্গে নামকরণের পালাবদল শুরু হয়। 'প্রেম' শব্দটা জাতে ওঠার ফলে প্রেমাঙ্কুর, প্রেমরঞ্জন, প্রেমবল্লভ, প্রণয়বল্লভের ছড়াছড়ি দেখা যায়। স্থনীতি, স্থরীতি, স্থরুচি, স্থপ্রীতি, ভক্তি, শ্রদ্ধা, প্রজ্ঞা, মৈত্রী নাম চলতে লাগল মেয়েদের মধ্যে। দ্বারিক গাঙ্গুলীর "নাম রেখেচি ভক্তি-উষা, ঘুচাইবে ভারত নিশা" — এমনি কত গান আমরা সমাজের মেয়েদের মুখে শুনেচি। নববিধান আর সাধারণ সমাজ মিলে কোমর বেঁধে নতুন নাম তৈরির ঝোঁকে বিধানচন্দ্র আর সাধারণচন্দ্রের স্থষ্টি করলেন। বিধির বিধানে বিধানচন্দ্র বাঙলা দেশে স্থদীর্ঘকাল নেতৃত্ব করলেন, সাধারণচন্দ্র কোথায় অস্ত গেলেন কে জানে? শিবনাথ ঠাট্টা

করে লিখলেন, এরপর বন্ধুদের মধ্যে যাঁর পুত্রসন্তান হবে তার নাম রাখবেন 'অনুষ্ঠানপদ্ধতিচন্দ্র'। আচার্য হলেও শিবনাথ চিরদিনই ছিলেন রসিক।

সে-যুগের তারাশঙ্কর তর্করত্ন মেয়ের নাম রেখেছিলেন কাদম্বরী। এ-যুগের কবিশেখর তাঁর দুই ছেলের নাম রেখেচেন কবিকঙ্কণ আর কবিরঞ্জন। রাখালদাস অদ্রীশবাবুর নাম শশাঙ্কগুপ্ত কেন রাখেননি, জানিনে। মাইকেল ছিলেন সুন্দর সুন্দর নামের ভক্ত। ছেলে-মেয়েদের চমৎকার নাম রেখেছিলেন। চিত্রাঙ্গদা প্রমীলাকে রামায়ণ থেকে উদ্ধার করেন। শর্মিষ্ঠাকে আবিষ্কার করেন, বরুণানীর নাম বদলে বারুণী করে দেন ব্যাকরণ অগ্রাহ্য করে ('পত্রাবলী' দেখুন)। বঙ্কিমচন্দ্র দেশ জুড়ে শৈবলিনী, মৃণালিনী, সূর্যমুখী, প্রফুল্ল, কুন্দ আর ভ্রমরকে ছড়িয়ে দিলে কি হবে? অন্তঃপুরে রক্ষণশীল ছিলেন। নইলে ছেলে ছিল না, তিনটি মাত্র মেয়ের নাম—শরৎকুমারী, নীলাব্জকুমারী, উৎপলকুমারী ছাড়া আর কিছু কি রাখতে পারতেন না? বঙ্কিমের আয়েষা নাম দেখেচি একটিমাত্র হিন্দু মেয়ের। রবীন্দ্রনাথের বেলায় কোনো বিতর্ক সৃষ্টি না করে শুধু এইটুকু বলব যে তিনিও প্রথাকে মেনেছেন পুত্রদের বেলায় এবং তাঁর তিন কন্যার নামে আর যাই থাক, কবিত্ব নেই (থাকা উচিত ছিল, এমন কথা এর দ্বারা আদবেই বলা হচ্চে না!)। শেষ জীবনে কবি তাঁর বাড়িঘরের যেসব বিচিত্র নাম রাখেন (উদীচী, পুনশ্চ, কোনার্ক, শ্যামলী, উদয়ন, উত্তরায়ণ) তা বাঙ্‌লাদেশ মুগ্ধ বিস্ময়ে লক্ষ্য করেছিল। তাঁর দেওয়া অসংখ্য অপূর্ব নাম বহু বাঙালি ছেলেমেয়ে আজও গর্বের সঙ্গে বহন করে চলেচেন। তাঁর বইয়ের নাম দিয়ে বহু নামকরণ আমরা দেখেচি, যেমন—মানসী, চিত্রা, মালিনী, কণিকা, ক্ষণিকা, কল্পনা, চৈতালী, লিপিকা, গীতাঞ্জলি, গীতালি, বৈকালী, রক্তকরবী, শ্যামলী, বীথিকা, বিচিত্রিতা, বনবাণী, পূরবী, বলাকা, মহুয়া, ফাল্গুনী, অরূপরতন ও মালঞ্চ। এছাড়া মহুয়ার নাম্নী থেকে জয়তী, পিয়ালী প্রভৃতি নামও বহুল প্রচলিত।

বাঙ্‌লা বইয়ের নামে মানুষের নামকরণের রেওয়াজ উঠেচে, তা পঞ্চাশ বছর হবে (সযত্নে মনে রাখবেন 'গীতা' বাঙ্‌লা বই নয়)। মণীন্দ্রলালের 'রমলা' কি আজকের বই? ও-বই পড়ে একডজন অন্তত বাঙালি মেয়ে তাঁদের কন্যাদের নাম রমলা রাখেন। জর্জ এলিয়টের *Romola*-র কথা তাঁরা জানতেন না। দিলীপ রায়ের 'অনামী' বেরিয়েছিল ১৩৩৭-৩৮ সালে (যদ্দুর মনে পড়ে), ঐ যুগের নাম হল অনামী ও অনামিকা। তখন 'মনামী'ও শুনেছিলুম। এটি সম্ভবত Mon Ami শব্দদুটিকে নিয়ে মনোহর সন্ধিপ্রস্তাব। এ-নাম কি টিকেছিল? দিলীপকুমারের

খ্যাতির শিখর থেকে একটি উজ্জ্বল রচনা 'তীর্থঙ্কর'। বেরিয়েছে ১৯৪০-৪১ সালে। এ-যুগের অনেক তীর্থঙ্করের জন্ম ঐ সালে। কবি স্থকান্তের মৃত্যুর পর 'স্বাধীনতা' পত্রিকায় তাঁর দাদা লেখেন যে, মণীন্দ্রলালের 'স্থকান্ত' পড়েই, তাঁরা ঐ নামটি নির্বাচন করেন। 'সত্যাসত্য' উপন্যাসে অন্নদাশঙ্কর লিলি, ডলি ও বেবীর কাঞ্চী, কৌশাম্বী ও উজ্জয়িনী নাম রেখে 'বিচিত্রা'র পাঠকমহলে কেমন চমক সৃষ্টি করেন, তা আজও মনে পড়ে। তারপর থেকে চালু হয়েছে মিথিলা, বিদিশা, বিনীতা (অযোধ্যার জৈন নাম), বিশালা ইত্যাদি। শ্রাবস্তী নাম কখনো শুনিনি, ভারী বলেই কী ?

সংস্কৃত ছন্দের নাম বেপরোয়া চালাবার চেষ্টা করেছিলেন চারু বাঁড়ুজ্যে। তাঁর গল্পের সেই রুচিরা, যার কবরীতে পুষ্পিতাগ্রা, চক্ষে শার্দুল, ললাটে বসন্ত-তিলক, কণ্ঠে মালিনী, বক্ষে ইন্দ্রবজ্রা, চরণে মন্দাক্রান্তা—তাকে এখনো মনে আছে। তবে মেয়েমহলে ঐ নামগুলোর চল বেশি হয়নি।

বইয়ের নামে, গল্প-কবিতার নামে নাম রাখতে উৎসাহিত বোধ করে আমি একদা আমার দুই বন্ধুকন্যার নাম রেখেছিলুম—পুঁই-মাচা আর নকৃশি-কাঁথা। কত স্থবিধে বলুন তো। বিভূতিভূষণ-জসিমউদ্দীনকে একসূত্রে গাঁথা হতো, পল্লীপ্রীতির চূড়ান্ত হতো, নামের নকল হতো না। কিন্তু অরসিকেষু কিনা, তাই গ্রাহ্য হল না। ওদের নাম রাখা হল শর্বরী আর শতরূপা।

জম্বুরা, আঞ্জীর আর করঞ্জ নাম তিনটি কেমন ? যদিও ওদের অর্থ বাতাবীলেবু, যজ্ঞডুমুর (বীরভূমে পেয়ারা) আর করমচা, তবু দেখুন দিব্যি নাম। 'নীলাঙ্গুরীয়' উপন্যাসে শৈলেন তার বন্ধু-পত্নীর নাম রেখেছিল অম্বুরী, যার নাম তামাক। খাসা নাম, তবে রাখতে একটু ভরসা চাই, এই যা। ছেলেবেলায় সরস্বতী পুজোর দিনে আমরা ভদ্রকালী নাম নিয়ে অনেক মাথা ঘামিয়ে এই সমাধান করেছিলুম যে—মা-কালীর কাপড়চোপড় নেই তাই তিনি অভদ্র, আর মা সরস্বতীর দামী বেগ্‌নী রঙের বেনারসী আছে (তখন এত শ্বেতবসনার পুজো দেখিনি) তাই তিনি ভদ্রকালী। ঠিক এর জুড়ি হল শান্তকালী, তা ভেঙে ঠাণ্ডাকালী। খাঁড়া হাতে মানুষের মুণ্ডু ঝুলিয়ে যিনি দাঁড়িয়ে থাকেন, তিনি শান্তও নন, ঠাণ্ডাও নন—এটুকু আমাদের সবারই মনে হতো, তবে গবেষণা-কার্যে এগুতে ভরসা হয়নি। বড় হয়ে স্থধীরচন্দ্র সরকারের অবিস্মরণীয় 'গন্ধমাতাল' পড়তে গিয়ে ঠাণ্ডাকালীকে দেখে চমকে উঠি। পাশের বাড়িতে একজন ছিলেন ভালচাঁদ। চাঁদের বৃদ্ধি ক্ষয় আছে, তাই বলে তাকে ভালো-খারাপ বলাটা কী

ব্যাপার তা অনেক মাথা খুঁড়েও বুঝতে পারিনি। শেষ পর্যন্ত দুর্গাপুজোর সময় পুরুত ঠাকুর বলে দিলেন, ওটি গণেশের নাম। ভালচাঁদ, সখীচাঁদ, প্রেমচাঁদ— এসব কিন্তু হিন্দুস্থানী দেশের নাম।

তখন এত নিত্যি নিত্যি এদেশ-ওদেশ করা মধ্যবিত্ত মানুষের সাধ্যে কুলোতো না। তাই পশ্চিমে একবার বেড়াতে গেলে সেই স্মৃতিকে ঠাকুমা-দিদিমারা নাতিনাতনীর নামের মধ্যে ধরে রাখতে চাইতেন। তাই কাশী, গয়া, অযোধ্যা, দ্বারকা, বৃন্দাবন, মথুরা, কৈলাস, কেদার এসব পোশাকি নাম ছাড়াও—শ্রীজী, লাল্জী, লাড্লী, গুড্ডী এসবেরও আবির্ভাব হয়েছিল। শ্রীজী, লাড্লীজী অর্থাৎ রাধা, লালজী অর্থাৎ দুলাল, গুড্ডী পুতুল। রসায়নের প্রখ্যাত অধ্যাপক ছিলেন লাড্লীমোহন মিত্র। ভাইয়া, মিঠুয়া, মুন্না, মুন্নী, বেটা, বাচ্চা এই শব্দগুলো প্রবাসী বাঙালিরা ব্যবহার করতেন—এখনো কিছু কিছু চল আছে। এই যুগের কলকাতা শহরে সন্তান অর্থে 'বাচ্চা' শব্দের প্রয়োগ বছর দশেক হল দেখা যাচ্চে। এখন 'ছেলেপিলে' অতি অশালীন শব্দ, 'কাচ্চাবাচ্চা' সভ্য। তাই দিদির ছেলে, দাদার ছেলের পরিবর্তে শুনতে পাই দাদার বাচ্চা, দিদির বাচ্চা (আমরা জানতুম 'মানুষের ছেলে' আর বেড়ালের 'বাচ্চা')। আমরা কাঁদলেও ভাষা বদলাবে, সুতরাং দুঃখ নেই। সেদিন এক উগ্র আধুনিকার মুখে বাবার বাচ্চা পর্যন্ত শুনেছি। এঁরা আবার হিন্দী-বিরোধী! যাক, ভাষা নিয়ে অস্থানে বিরোধে কাজ নেই!

আমার নিজের বিশ্বাস সংস্কৃত ভাষা থেকে মনুর বিধানমাফিক 'মঙ্গল্য মনোহর' এবং 'সুখোচ্চার্য' নাম বাঙালিরাই শুরু করেন।

এখনো বাঙ্লা ভাষায় রোমান্টিক নামের ছড়াছড়ি। কালিদাস, শ্রীহর্ষ, বাণভট্ট এঁদের ভাঁড়ার থেকে সুন্দর নাম প্রায় সবই লুঠ করে নেওয়া হয়েচে। প্রাকৃত নাম বাঙালি পছন্দ করে না, কেননা 'গাথা-সপ্তশতী' চলেনি। তাছাড়া কালিদাসের নোমালিআ আর অনিরিনাও কখনো শুনিনি। প্রাক্‌বিবাহ বধূ-নির্বাচনের কালে যে-সব মেয়েদের ফুলের নামে নাম, তাদের বাৎস্যায়ন বাতিল করে দিতে বলেচেন। কালিদাস মানেননি, আর ভাগ্যে মানেননি, তাই আমরা তাঁর থেকে এবং পরবর্তী কবিদের থেকে মনোহরণ নাম সব পেয়েছি। তাঁর দেওয়া রাজবাড়ির দাসীদের পর্যন্ত নাম মধুকরিকা আর পরভৃতিকা (সীতাদেবীর উপন্যাস দেখুন)। সুন্দর হলে কী হবে, সহজ নয়, বড় সাজানো, বড় পোশাকি। তা রাজবাড়ির ব্যাপার কিনা! কিন্তু শকুন্তলার ছোট্ট ছেলের জন্যে একটা মিষ্টি

ডাকনাম তিনি অনায়াসে তৈরি করতে পারতেন, কেন করেননি? অত ছোট ছেলের সর্বদমন, টিকেন্দ্রজিৎ কিংবা পার্থপ্রতিম কোনো নামই যে মানায় না। এতেই প্রমাণ হচ্চে যে কালিদাস অন্তত রাঢ় দেশের বাঙালি ছিলেন না।

প্রসঙ্গ শেষ করার আগে বড্ড ইচ্ছে করচে সংস্কৃত সাহিত্য থেকে কিছু অসংস্কৃত নাম শোনাই (কিঞ্চিৎ করুণা এবং ধৈর্যের প্রার্থনা করি—আপনার মতো বিদুষীর কাছে) এই মাত্র গুটিকতক—অঙ্গোক, অপ্যয্য, অমরুক, অরমুড়ি, অর্গট, অল্লট, ইচ্ছট, উঙ্ক, কর্ক, কহ্লন, কুল্লূক, কৈয়ট, খিঙ্খিল, খৈপাক, গোলূন, চঙ্কুন, চাট, চিপীট, চেল্ল (ইনি শক), জুমুর, জেজ্জট, ডিত্থ, ডবিত্থ (মানুষও বোঝায়, কাঠের হাতিও বোঝায়, বাঙলা দেশের বেনেবৌকে স্মরণ করুন—যে শব্দে মানুষ, পাখি, মাটির পুতুল সবই বোঝায়। খড়দার ঘাটে বেনেবৌকে দেখে সিস্টার নিবেদিতার অতুলনীয় উচ্ছ্বাস অপ্রসঙ্গেও মনে পড়ে যাচ্চে) তুঞ্জীন, তীসট, নাকোক, নাহিল্ল, পাজক, পাট্টুক, ফল্গুবল্গু, বাভট, বিড্‌ডুক, বিব্বোক, বোপ, ভামহ, ভুজ্জ্যু, ভৌণ্ড, মম্মট, মেণ্ঠ, রামিল, রিস্সু, রুয্যক, রেভিল, শালূক, সেন্দুক, সোল্লোক, হাল, হিঙ্গুক। মহিলাদের নাম—ছমচ্ছমিকা, ঝমজ্‌ঝমিকা, দিদ্দা, বিজ্জা, মারুলা, মোরিকা, রক্কা, রট্টা ('কালের মন্দিরা'য় শরদিন্দুর নায়িকা)।

সর্বশেষে একটি অপরূপ নাম শুধু আপনার জন্যেই উপহার দিচ্চি—সেটি 'বল্গুকল্ল'—হাজার বছর আগের এক বাঙালি কবির নাম। আশা করি এখন আপনার প্রার্থিত নামটি পেয়ে গেছেন—ঐটি 'চিত্রকল্ল'—বেশ খুশি হয়েছেন তো? ওপরের নামগুলো কেমন লাগল? শ্রদ্ধা করতে সময় নেবে? তা নিকৃগে, শোনেননি কীর্তনিয়ার মুখে—

যেমন বীজের মধ্যে বৃক্ষ থাকে
নাহি যায় দেখা।
তেমনি নামের মধ্যে কৃষ্ণ থাকেন
ধড়াচূড়া আঁকা॥

ওই নামগুলোও তাই। ওদের মধ্যে আছেন (বিশেষ করে বাঙ্‌লা আর কাশ্মীরের) রাজা, মন্ত্রী, দার্শনিক, ভাষ্যকার, চিকিৎসক, ঐতিহাসিক, আলঙ্কারিক আর কবি।

ছাতা নিয়ে অনেক রঙ্গ

কথায় বলে 'নাইক পাঁজি নাইক পুঁথি/সাতুই আষাঢ় অম্বুবাচী।' অম্বুবাচী প্রবৃত্তি অর্থাৎ বর্ষার শুরু। মোট কথা, ঝমঝমে বর্ষা, অথচ বেরোতে হবে। ঘরে থাকার সুখ বা কোথায়—দিদিমাদের যুগে অম্বুবাচীর সময়ে গামলাভরা ক্ষীর, পেল্লায় কাঁঠাল, তার সঙ্গে ল্যাংড়া বোম্বাই যা ঘরে মজুত করা হতো, তা থেকে সবাই ভাগ পেত। মায়েদের যুগে বর্ষার দিনে খিচুড়িতে গাওয়া ঘি পড়ত, বড়ি, পোস্তবড়া, পাঁপড়ের সঙ্গে মাছের অম্বল আর পাতের শোভা ছিল ইলিশের পেটি। সেসব দিনগুলো আলাদিনের দৈত্য এসে ফুসমন্তরে উড়িয়ে নিয়ে গেছে। মিলের মধ্যে দেখি রাস্তায় কাদা আর ঘড়ির কাঁটায় ন'টা বাজলে উপুজঝান্ত বৃষ্টি। সেই যন্ত্রণা সামাল দেওয়ার জন্যেই জুতো আর ছাতা। ভাবলুম, বড় মাপের কিছু লেখার তো মুরোদ নেই, না হয় জুতো-ছাতার কুলুজিই ঘাঁটি।

শুনুন তবে পুরাণের গল্পটা। সেই একদিন ভরদুপুর বেলায় জমদগ্নি মুনি তীরধনুক নিয়ে শরচালনা অভ্যাস করছেন, তাঁর সাধ্বী স্ত্রী রেণুকা এবড়ো-খেবড়ো বালি পাথরভরা রুক্ষ ডাঙা থেকে ছুটে ছুটে বাণগুলো কুড়িয়ে আনছিলেন। পরশুরামের মা হলে কী হবে, রেণুকার তেমন তেজ ছিল না, ঘেমে-নেয়ে গেলেন, পায়ের যন্ত্রণায় অস্থির। রেণুকার মন্থর গতি দেখে জমদগ্নি বুঝে নিলেন ব্যাপার। সূর্যের দিকে যেই শরসন্ধান করবেন—অমনি ভগবান আদিত্যদেব ছুটে এলেন চর্মপাদুকা আর 'রৌদ্রজলবারণার্থম্' উত্তম ছত্র নিয়ে। এই হল গিয়ে ছত্রপাদুকার জন্মকাহিনী। এটি আবার মহাভারতে অবিকল একই রকম আছে।

জুতো ছেড়ে ছাতায় আসি। ছেলেবেলায় রচনা বই থেকে গরু ঘোড়া মুখস্থ করে যেমন পরীক্ষার খাতা ভরাতুম, সেই মডেলে ছাতা কী জিনিস বোঝাতে গিয়ে বলতে পারি এটা খানিকটা কালো কাপড়, লোহার কতকগুলো শিক আর বাঁশ কিংবা বেতের বাঁকানো বাঁটের সমবায়ে রোদজল-আটকানো, গরু-তাড়ানো, বেধড়ক মারপিট ইত্যাদি বহুমুখী উদ্দেশ্যসাধক একটা অপরিহার্য বস্তু। যদিচ গ্রাম অঞ্চলের ছাতিবগলে মাস্টারমশাই কিংবা পুরুতঠাকুর আর দেখবার জো নেই।

আমাদের ছেলেবেলায় কালীঘাট বাজারে আটআনায় এক ধরনের ছাতা পাওয়া যেত। খুব কৃপণ মানুষ গরমের দিনে ব্যাভার করতেন। বর্ষায় চলত না, কারণ ভিজলে এর কালো রঙ কাপড়ে লাগত। একে বলা হতো 'দানী' ছাতা। বুঝিয়ে বলি—জ্যান্ত মানুষেরা সবাই জানেন যে মৃত্যুর পরে বৈতরণী নদী পার হয়ে তবে স্বর্গে বা নরকে যাওয়ার ছাড়পত্র পাওয়া যায়। যজমান এই আধুলির ছাতা কিনে শ্রাদ্ধের সময় অগ্রদানী বামুনকে দিতেন, সঙ্গে আরও দিতেন চার গণ্ডা পয়সার পটপটে কাঠের খড়ম। এই ছাতা মাথায়-খড়ম পায়ে, যজমানের উদ্দিষ্ট ব্যক্তি 'যমদ্বারে মহাঘোরে তপ্তা বৈতরণী নদী'—নাকি অক্লেশে পার হয়ে যেতেন। সুতরাং বেঁচেই থাকুন কি ওপারেই যান, সর্বদা ছত্রপতিরূপে নিজস্ব ছাতা নিয়ে বিরাজ করবেন। ভালো ছাতাও ছিল বই-কি, বাজারে পুজোর দিনে শাঁখ বাজিয়ে সমন্ত্রক ছত্র মা-দুর্গাকে দান করা হতো।

ছাতার মহিমা উচ্চকণ্ঠে গেয়ে গেছেন কবি বিদ্যাপতি। আমাদের কলেজের বড় পণ্ডিতমশাই প্রথমদিন ক্লাসে এসেই সরস্বতী, বিদ্যাপতি, প্রতিদ্বন্দ্বী ইত্যাদি আরও পাঁচটা-সাতটা বানান জিগ্যেস করতেন, মাইকেলের খানিকটা পদ্য কিংবা বিদ্যাপতির যে-কোনো দোহা মুখস্থ বলতে পারলে সে তাঁর কাছে চিরদিনের জন্যে মার্কামারা 'ভালো' হয়ে থাকত। আমিও ঠেলায় পড়ে বিদ্যাপতি মুখস্থ করি। ভাগ্যিস করেছিলুম, তাই অবলীলায় বলতে পারি—

শীতের ওঢ়নী পিয়া গীরিষের বা।
বরিষার ছত্র পিয়া দরিয়ার না॥

এ পদ্য অবিশ্যি আপনারা নিজেরাই বুঝে নেবেন, আমাকে আর 'লুচি চিনি ছোলা' করে বঙ্গানুবাদ করতে হবে না। এর পরে ভাবা যাক প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কথা। বড়বাজার থেকে পটলডাঙার (সংস্কৃত) কলেজে বালক ঈশ্বর যখন যেতেন তখন দুর থেকে মনে হতো রাস্তা দিয়ে একটি ছাতা-ই শুধু হেঁটে যাচ্ছে। 'অগ্রজ মহাশয় বাল্যকালে অত্যন্ত খর্ব্ব ছিলেন'—কনিষ্ঠ শম্ভুচন্দ্র এমনই বলেন। বিদ্যাসাগরের পরে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ'তে পাই কাশী-বাবার পাকা রাস্তার ধারে বর্ষার দিনে সূর্যমুখী প্রায় জ্ঞান হারিয়ে পড়ে—পথিক ব্রহ্মচারী এক হাতে গোলপাতার ছাতা নিয়ে ভিজতে ভিজতে চলেছেন—এই গোলপাতা কিন্তু গোল নয়। গোলদীঘি যেমন চৌকো হলেও নামে গোল, ঠিক তেমনই। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার এই ছাতা তৈরির পাতা সরু আর লম্বা কিন্তু নামে গোল। পাতাগুলো বুনে বুনে ছোট লাঠি পরিয়ে গোল আকারে ছাতা

করা হয়। মাথায় একটু চুড়ো বাঁধা। হোগলা বুনে যে ছাতা হয় তা টেকে না। তালপাতা থেকে ছাতি দোনা তৈরি হয়। সরু করে কেটে তা দিয়ে চ্যাটাইও বোনা হয়। সরু বাঁশের মাথায় এইসব পাতার ছাতা গঙ্গার ঘাটে খুব দেখা যায়। ঘাটওয়ালা বামুন আরশি, চিরুনী, ঘষা চন্দন, হরিনামের ছাপ, কাপড়চোপড় সব নিয়ে ছাতার নিচে বসে থাকে। কাশীর ছবিতে দেখা যায় অহল্যাবাঈ আর দশাশ্বমেধ ঘাটে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ছাতার কী বাহার। টোকা বা মাথালও তালপাতা দিয়ে বোনা হয়। মাথাটুকু বাঁচানোর জন্যে এরা ছাতার ছোটো সংস্করণ।

কী দুঃখের কথা যে রবীন্দ্রনাথ ছাতা আবিষ্কার বলে কোনো পদ্য লেখেননি, তবে কালো ছাতা মাথায় তাঁর মাস্টারমশায়ের যে হৃদয়বিদারক আগমন নয় আবির্ভাবের বর্ণনা 'জীবনস্মৃতি'তে পাই তা ভুলে যাওয়াও কষ্টকর। মেডিকেল কলেজের ছাত্র কোনো অঘোরবাবু শিশু রবিকে পড়াতেন, তাঁর স্বাস্থ্য ছিল অন্যায় রকমের ভালো, কখনও কামাই করতেন না। একদিন সন্ধ্যায় মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে। পুকুর ভেসে গেছে, রাস্তায় এক হাঁটু জল। মাস্টারমশায়ের আসবার সময় দু-চার মিনিট পেরিয়ে গেছে। তবু বলা যায় না, তাই ছাত্র রাস্তার মুখে বারান্দায় চৌকি নিয়ে গলির মোড়ের দিকে করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন—'পততি পতত্রে বিচলিত পত্রে'—যাকে বলে। হঠাৎ তাঁর বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ডটা যেন আছাড় খেয়ে 'হা হতোহস্মি' বলে পড়ে গেল। দৈব দুর্যোগে অপরাহত সেই কালো ছাতাটি দেখা দিয়েছে!

শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্তের সঙ্গে ইন্দ্রনাথের প্রথম দেখার দিনেই ছিল 'ছত্রভঙ্গ'। ইস্কুলের খেলার মাঠে দু' দল ছেলের ফুটবল ম্যাচ, একদল হেরে যেতেই মারামারি শুরু হয়ে গেল। অচিরে শ্রীকান্তের পিঠের ওপর আস্ত ছাতির বাঁট পটাশ করে ভাঙল। আরো গোটা দুই-তিন গেল মাথার আর পিঠের ওপর। পাঁচ-সাতটা ছোকরা যখন শ্রীকান্তকে ঘিরে ধরেছে, সেই সময় ইন্দ্রনাথ এসে ঘুসিটুসি মেরে শ্রীকান্তকে নিয়ে ব্যূহভেদ করে বেরিয়ে গেল।

খেয়ালখুশির রাজা সুকুমার রায়ের আঁকা ছাতা বগলে মানুষের ছবির সঙ্গে কিছু কবিতাও আছে, যেমন, 'সাত জার্মান জগাই একা তবুও জগাই লড়ে/ এলোপাতাড়ি ছাতার বাড়ি ধুপুস ধাপুস কত/ চক্ষু বুঁজে কায়দা খেলায় চর্কিবাজির মতো।'

বাংলাদেশে আর ওড়িশায় বিধবাদের মধ্যে জুতো আর ছাতা এই দুইয়ের

ব্যবহারই এককালে নিষিদ্ধ ছিল। ওড়িয়া সাহিত্যের দিকপাল ফকিরমোহন সেনাপতির কন্যা একবার কপিলাশ পাহাড়ে তীর্থদর্শনে যাচ্ছিলেন—মাথার ওপরে সূর্যের তেজ আর পায়ের নীচে গরম বালি তাঁকে একেবারে অচল করে ফেলল। তখন বিস্তর ঝামেলা করে বহু দূর থেকে কলার খোলা আর আস্ত আস্ত পাতা সংগ্রহ করে আনা হল। মোটা কলার পেটো কলার ছটা দিয়েই দুই পায়ে বেঁধে, মাথায় কলার আওট পাতা দিয়ে তিনি তীর্থ করলেন। ফকিরমোহনের পৌত্রীর মুখে আমি কাহিনীটি শুনেছি। আর একটি মেয়েলি (?) সংস্কারের কথা জানি। দক্ষিণদেশের কামকোটিপীঠের শঙ্করাচার্য কলকাতায় এসেছেন—পরম নিষ্ঠাবতী ভাগীরথী বৈদ্যনাথন আমাদের সঙ্গে ডালি সাজিয়ে রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলেছেন। হঠাৎ বৃষ্টি আসতেই আমি ছাতি খুলে তাঁর দিকে এগিয়ে যেতেই তিনি যেন ছিটকে পালিয়ে গেলেন। বৃষ্টি বাড়তে যেই আবার গেলুম, তখন তীব্র কণ্ঠে বলে উঠলেন—'বহিনজী, কেন এমন শত্রুতা করছেন? স্বামী থাকতে সধবা মেয়েদের ছাতা মাথায় দিতে নেই—এটুকুও জানেন না?' জমিদারবাড়ির সামনে দিয়ে প্রজাদের ছাতিমাথায় চলা কোনো কোনো স্থানে নিষিদ্ধ ছিল।

দেশবরেণ্য ব্যক্তিদের মূর্তি শহরের এখানে-ওখানে দেখতে পাই। বলছিলুম কী, মূর্তির পিছনদিকে যত্ন করে তার মাথায় একটি সুন্দর ছত্র পরিয়ে দিলে হয় না! (কাক-পাখি তাড়াবার যখন উপায় নেই)। এখন স্ত্রীপুরুষ নানা ধরনের দামি সুন্দর ছাতা ব্যবহার করেন, ঝোলা ব্যাগে কিংবা ব্রিফকেসে থাকে। এর শোভা, বৈচিত্র্য আর কলাকৌশল আধুনিকেরাই বর্ণনা করতে পারবেন। আমাদের যুগের বাঁশের ছাতা এখন শুধু ব্যাপারিরা ব্যবহার করেন। গরুর হাটে গরু কেনাবেচার সময় ছাতা খুলে ছুটিয়ে নাকি তাদের তেজ পরীক্ষা করা হয়। সামনে ছাতা খুলতে দেখলেই গরু নাকি মরিয়া হয়ে দৌড়োয়।

দেবদেবীর মন্দিরে কতরকমের আর কত দামের যে 'ছত্রশোভা' তা সংক্ষেপে বলা শক্ত। গৃহস্থের ঘরে ঘরে পেতলের সিংহাসনের পিছনে স্যাকরা ঝালাই করে রুপোর ছোট ছোট সুদৃশ্য ছাতা এঁটে দেন—কোথাও শালগ্রাম, কোথাও বাণলিঙ্গ, কোথাও-বা বালগোপাল থাকেন। কালীঘাট মন্দিরে মহারাজ নবকৃষ্ণ সোনার ছাতা দিয়েছিলেন। চাঁদোয়ার নীচে রুপোর ছাতা উৎসবের দিনে আমরাও দেখেছি। এগুলো শিক থেকে ঝুলন্ত। অনেক শিল্পশাস্ত্র—তার অনেক বিবরণ। সমস্ত উত্তম ছত্রই শুভ্র এবং রত্নযুক্ত। চন্দনকাঠের দণ্ডযুক্ত বহুশলাকা ছত্রের মাথায় সোনার কলস, আর মুখের আবরণ একটি বৃহৎ হীরক। এসব ছত্রের বর্ণনা

রামায়ণেও আছে। শুধু মহাভারত, বৃহৎ সংহিতা, যুক্তিকল্পতরু নয়—কাদম্বরী, হর্ষচরিত, দশকুমারচরিত, নৈষধচরিত সর্বত্র ছত্রের একছত্র রাজত্ব। মাদুরায় মীনাক্ষীদেবীর আগাগোড়া মুক্তোর ছাতা আর মশারি চোখে দেখলে বোঝা যায় প্রাচীন সাহিত্যে নিছক অত্যুক্তি নেই। কালিদাসের দুষ্মন্ত বলেছিলেন, 'রাজ্যং স্বহস্তধৃতদণ্ডমিবাতপত্রম'—অর্থাৎ, প্রকাণ্ড ভারী ছাতা সর্বক্ষণ নিজেকে বইতে হলে যেমন আরামের চেয়ে ক্লেশই বেশি, রাজত্ব করাও তেমনি অবসরবিহীন শ্রমের কাজ।

রাজদরবারের ছবিতে ছত্রধারিণীদের দেখা পাই। ভগবান রামচন্দ্রের ছবিতে শুধু দেখি তাঁর লক্ষ্মণভাই ছাতা নিয়ে দাঁড়িয়ে। অন্য প্রায় সর্বত্র এই কাজের জন্য সুন্দরী মহিলাদের নির্বাচন করা হতো। অজন্তার ছবি থেকে শুরু করে মধ্যযুগের মোগল আর রাজস্থানি ছবিতে ছত্রধারিণীরা রাজার পার্শ্বচর।

এই সেদিনের 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা'-তেও ক্ষীরি ছত্রধারিণীর খোঁজ করেছে। ছাতার খুরে দণ্ডবৎ করে এবার বিদায় হই। দাশু রায় সখেদে বলেছিলেন—'ছাতি গেল হে, ছাতি ফাটে মৃত্যু ভালো এখন।' এখনকার মানুষ কিন্তু কোনোকিছুর জন্যেই আর কাঁদে না। এই হল সেকাল আর একাল।

কলকাতার ব্যাপ্তি

'নন্দের আলয়ে কৃষ্ণ দিনে দিনে বাড়ে'—হ্যাঁ, তা তো বাড়বেই। সত্তর-পঁচাত্তর বছর আগে যে কলকাতা দেখেচি, সে তো আর নেই। উত্তর আর মধ্য কলকাতাই বাড়তে বাড়তে ভবানীপুর এলো কলকাতা শহর। মাঠ পুকুর উজিয়ে—কালীঘাট মন্দির, তারপর তিনকোণা পার্কের উল্টোদিকে মহানির্বাণ মঠ—খুব জংলা জায়গা ছিল। প্রভু নিত্যগোপাল বলতেন, 'ই সব সোনেকা থালি হোগা'—সংকীর্তন হতো 'নিত্যগোপাল প্রাণগোপাল'। এখনো মঠের নামের নিচে লেখা আছে কালীঘাট। 'স্বর্ণলতা' উপন্যাসের লেখক খুব ফলাও করে যাত্রীদের কালীঘাটে আসা বর্ণনা করে গেছেন। হেস্টিংসের বাড়ি, আলিপুর দেওয়ানি-ফৌজদারি আদালত কলকাতার সীমানা ঘেঁষে, হরিণবাড়ি জেলখানার হেলানো লালবাড়িও তাই। বড়লাটের বেলভিডিয়ারে এখন হয়েছে জাতীয় গ্রন্থাগার। পাশে পশুশালা। রামব্রহ্ম সান্যাল মশাই (হিরণ সান্যাল মশায়ের ঠাকুর্দা) ছক কেটে কেটে ছোট, বড় ঘর পাঁচিল বেড়া দিয়ে বাঘের ঘর, সাপের ঘর কত কি তৈরি করলেন। শিবপুর গঙ্গা পেরিয়ে, সেখানে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ। এখনকার মতো কৌলীন্য ছিল না, দুষ্টু, বেয়াড়া, বাপে-খেদানো ছেলেরাই নাকি পড়ত। তার আগে শ'খানেক বছর আগে বঙ্গীয় নিম্বার্ক আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন—হাইকোর্টের উকিল তারা-কিশোর চৌধুরী। সিলেটের মানুষ। পরে তিনি হয়েছিলেন ব্রজবিদেহী সন্তদাস। পরবর্তীকালে প্রয়াগে কুম্ভমেলার চতুঃসম্প্রদায়ের মহন্ত। এখনো ঠিকানা লেখা হয়—পোঃ বট্যানিক্যাল গার্ডেন। বেশ খানিকটা উত্তরে রেসকোর্স, খেলার মাঠ, রাজ্যপাল ভবন। আবার দক্ষিণে ফিরে আদিগঙ্গার ধারে কেওড়াতলা শ্মশান।

কেওড়াতলা নামের মতোই কেয়াতলা। বাসিন্দেরা প্রায় সকলেরাই গোরু পুষতেন, গিন্নিরা পেল্লায় বঁটি ধরে খড় কুচোতেন। ১৯২৮ সালে হল ঢাকুরিয়া লেক। বেশ কিছুদিন মিলিটারি হাসপাতাল ছিল গোরাদের চিকিৎসার জন্য। আশেপাশে বস্তি। নিউ থিয়েটার্সের 'সাথী'তে দেখেছি—গলায় হারমোনিয়ম ঝুলিয়ে কে. এল. সায়গল বলছেন—কেয়াতলা বস্তিতে থাকি। পরে ওখানেই টালিগঞ্জ স্টুডিও।

মধ্যবিত্ত পাড়ায় আসুন—এখন যেখানে হাজরা পার্ক, ওখানে ছিল ধোবাদের আড্ডা দুই পাড়ে—ধোবারা কাপড় আছড়াতো। আশুতোষ কলেজ হবার আগে ওদিকে ছিল জিমনাশিয়াম, পরে কটেজ লাইব্রেরি। গুটি-গুটি উত্তরে গেলে ভাড়াটে ঘোড়াগাড়ির আড্ডা। তারপর অগুণতি হোটেল আর সস্তা চা-খানা। প্রতুল গুপ্ত মশাই তাঁর 'দিনগুলি মোর' আত্মজীবনীতে এখানকার 'ডবল হাফ' চা আর রুটিতে 'চিনি না মরিচের' সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন।

ভবানীপুর কোর্টের কাছে, তাই উকিলপাড়া। শরৎচন্দ্রের 'নিষ্কৃতি' উপন্যাসে গিরিশ মুখুয্যের এখান থেকেই তো তার মক্কেল বিলেতে জাহাজ জাহাজ 'খড়' পাঠাতেন। ভবানীপুর ছেড়ে জেলেপাড়া। তারপর বৌবাজার ছানাপটি—ভীম নাগ নবকৃষ্ণ গুঁই। ভাদ্দর, পৌষ আর চোতমাসে—লগনসা না থাকায় ছানা এত সস্তা হতো কী বলি! খাসা মুড়কি, কড়াদানা, চমচমে ময়রার দোকান বোঝাই। বড় মুদিদের ভালো গোটা মশলা আর সাড়ে বত্রিশ ভাজা।

বৌবাজার পেরিয়ে পটলডাঙায় মেডিকেল কলেজ। উল্টোদিকে প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রিটে বড়ালবাবুদের বহুকালের বাস। রাস্তার উপর শিবমন্দির, তারপর বসুমল্লিক পরিবার। দয়াময়ী মন্দির। একটু ভেতরে ঢুকলে কায়স্থবাড়ির শিবমন্দির। শ্রীগোপাল মল্লিক লেনে 'কায়স্থ' পত্রিকার আপিস, যেখান থেকে কায়স্থদের পৈতে নেবার হুজুগ ওঠে ১৯২৮ কি '৩০ হবে। মেডিকেল কলেজ পেরিয়ে হেডেন হিন্দু হোস্টেল, তারও কতকাল গেল, মির্জাপুরে পুঁটিরাম, মাধববাবুর বাজার হল পরে আশুতোষ বিল্ডিং। স্যার আশুতোষকে পুঁটিরাম চাঙারি চাঙারি কাঁচাগোল্লা সদ্য মেখেই পাঠিয়ে দিতেন, খেতে খেতে উনি পোস্ট গ্রাজুয়েট সিলেবাস তৈরি করতেন। এসব পেরিয়ে মহাবোধি সোসাইটি। আরো উত্তরে বেনারসীর দোকানগুলো। ব্রাহ্মসমাজের বাড়ি ঐ সমাজপাড়াতেই, ২১০ নম্বর কর্নওয়ালিস স্ট্রিটে, শিবনাথ শাস্ত্রী পাণ্ডা। বিদ্বান আর বিচক্ষণেরা সবাই যেতেন, এখন তো সারা বছরে ১১ই মাঘের মাঘোৎসবের ছুটি যেটা ছিল, তাও বন্ধ। নববিধান সমাজের আড্ডা ছিল কলুটোলা। রাজাবাজারে ছিল আচার্য কেশবচন্দ্রের 'কমল কুটির', পরে ভিক্টোরিয়া ইনস্টিটিউশন। হাতিবাগানে স্টার থিয়েটার, আরো, 'জানি, কিন্তু বলব না।'

দেশজুড়ে কত অদল বদল। আমাদের হ্যারিসন রোড হারিয়ে গেল। ইস্কুলের সিলেবাস, খাওয়া পরা সবেরই বদল, খুরজা ঘিয়ের বদলে এল পাকাউ/ডালডা। লালনীল পেন্সিলের বদলে রঙচঙা রিফিল। পত্রিকা বলতে আমাদের ছিল

প্রবাসী, ভারতবর্ষ আর বসুমতী। ছোটদের জন্যে. মৌচাক আর রামধনু—সব তফাৎ, সব তফাৎ। সব ঝুট্ হ্যায়। বৃদ্ধ বয়সে অনিদ্রার ওষুধের খোঁজে দমদম নাগেরবাজার যেতে হয়। কিছুই চিনতে পারিনে ফেরার পথে। আমি যেন রিপ্ ভ্যান্ উইঙ্কলের মতো কত যুগ পরে জেগে উঠেচি, কিছু যে বুঝতে পারচিনে! কেঁদেই বা কি করি! বাঁকের বাঁদিকে নির্লজ্জ চাঁদ ছাড়া আর সবই সিন্থেটিক।

বাসি লুচি

গুরুর অনুরোধে ঈশ্বরচন্দ্র ছাত্রজীবনে একটি শ্লোক লেখেন—

লুচী কচুরী মতিচূর শোভিতং জিলেবী সন্দেশ গজা বিরাজিতং
যস্যাঃ প্রসাদেন ফলার মাপ্নুমঃ সরস্বতী মা জয়তান্নিরন্তরম্।

দেবভাষায় এমন মজাদার শ্লোক দেবী নিজেও শোনেননি। তাই খুশি হয়ে ঈশ্বরকে সর্ববিদ্যার সাগর করে দেন।

১৮৭৮ সালে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ট্রেনে যেতে যেতে কার্মাটাঁড়ে নামলেন। এম্. এ. পাশ করার পরে লখনউতে সংস্কৃত পড়াতে যাচ্ছেন। ক'দিন আগে প্রচণ্ড জ্বর হয়েছিল। শরীর কাহিল। তাই ভাবলেন এতটা পথ টানা যাবেন না, বিদ্যাসাগরের কাছে নামবেন। রাতটা থেকে অমনি 'হর্ষচরিত' যেটা পড়াতে হবে, সেটাও ঝালিয়ে নেবেন। স্টেশনে মালপত্র রেখে পুঁটুলি হাতে ভেতরে যেতেই বিদ্যাসাগর 'বোস, বোস' বলে ডেকে নিয়ে বললেন, 'দেখি কি তোর পুঁটুলিতে। তোর মায়ের ভাজা? তাহলে আমি খাব।' (কে তাঁকে ওখানে লুচি ভেজে দিচ্চে?)। হরপ্রসাদ বললেন, 'না, মায়ের নয়, বড় বোয়ের ভাজা', (বড়-বৌ মানে বড় বৌদি)। তা শুনে ঈশ্বর বললেন, 'তবে তো আরও ভালো। ওরে, নন্দ আমার বড় আদরের ছেলে ছিল রে, অনেক আশা করে ওকে সোসাইটিতে এনেছিলুম।' নন্দকুমার ন্যায়চুঞ্চু হরপ্রসাদের দাদা, নব্যন্যায়ে দুর্ধর্ষ পণ্ডিত বলে—তাঁর আদরের ছিলেন, অল্পবয়সে নন্দকুমারের মৃত্যু ঈশ্বরকে শোকার্ত করে।

এইসময় একদল সাঁওতাল মেয়ে এক বোঝা ভুট্টা এনে বিদ্যাসাগরকে বেচতে শুরু করলে। ঐ পয়সা নিয়ে তারা হাটে যাবে কাজ করতে। হরপ্রসাদ তো থ! 'এত ভুট্টা আপনার কাছে থাবে কে?' ঈশ্বর বললেন—'কে খাবে নিজেই দেখবি।' হরপ্রসাদ বললেন, 'দু'দিনের ভাজা বাসি লুচি। ওগুলোও ওদের দিন।' ঈশ্বর বললেন—'ভালো ঘিয়ে ভাজা ছড়িয়ে দিচ্চি এর মধ্যে, ক'খানা খেতে পারব।' মোট কথা, অসুস্থ শরীর নিয়ে জেদী মানুষ ওই লুচি খেলেন।

কবি হেমচন্দ্র বাঁড়ুয্যে খেতে আর খাওয়াতে ভালোবাসতেন। ফি-শনিবার বন্ধুদের পদ্য লিখে লিখে ডেকে পাঠাতেন। একখানা নেমন্তন্ন পত্তর আশ্চর্যভাবে

রক্ষা পেয়েছে—কালের গতিতে। সেটি এই—

তপ্ত তপ্ত তপ্‌সে মাছ গরম গরম লুচি,
অজা মাংস ভাজা কপি আলু কুচি কুচি।
শীতের দিনে খাবে যদি তুলে থাবা থাবা
দশ নম্বর পদ্মপুকুর দৌড়ে এস বাবা॥

অবন ঠাকুর লিখেছেন তাঁদের কত্তাদিদিমা (সারদা দেবী) সুন্দর সুন্দর নাতিদের মধ্যে মধ্যে নিজের ঘরে ডাকিয়ে এনে লুচি আর ছোলা (কুমড়োর ছক্কা) খাওয়াতেন।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ স্টিমারে বা নৌকোয় শিকার করতে বেরুতেন। শিকার কিছুই মিলত না। নতুন বৌঠান রাশি রাশি লুচি ভেজে দিতেন, সেগুলি ধ্বংস করে তাঁদের মৃগয়াপর্ব শেষ হতো। তারপর রবীন্দ্রনাথ—'আত্মা জানে রসের রুচি, বাঞ্ছা করে কোফ্‌তা লুচি।' এক জায়গায় বলেছেন—'তারেও হেলা, বলো তো কোন দেশী?'

আমাদের শরৎচন্দ্র ক্ষ্যাণে অক্ষেণে নায়িকাদের দিয়ে লুচি ভাজিয়ে ছাড়তেন। 'চরিত্রহীনে' সেই পাথুরেঘাটার বাড়ি, রাত এক প্রহর পেরিয়ে গেছে, হেঁসেলের উনুনে আঁচ নেই—তবু কিরণময়ী উপেন্দ্রনাথকে বলে চলেছেন—'ঠাকুরপো, আমার সঙ্গে রান্নাঘরে এসো, দু'খানা লুচি ভেজে দিতে আমার দশ মিনিটের বেশী লাগবে না। ও ঝি, যাবার আগে কাঠের উনুনটা জ্বেলে দিয়ে যা মা।' ঝি বেরিয়ে গেলে ও-বই পড়তে পড়তে ছেলেবেলায় আমাদের বুক ঢিপ-ঢিপ করত। না জানি এরপর কী পড়তে হবে…

শশীশেখর বসু প্রয়াগের মাঘমেলায় বহুকাল আগে এক টানাপাখা-মার্কা সাধু দেখেছিলেন। দুই ঠ্যাঙে দড়ি বেঁধে কাকাতুয়ার মতন উঁচু আমগাছ থেকে তিনি ঝোলেন। এক চেলা যখন বলেন—সাধু বাজাওয়ে শংখ। তখন সাধু মুখ নীচু করেই শাঁখ বাজান। আর এক চেলা তাঁর কোমরে দড়ি বেঁধে দুরে বসে সর্বক্ষণ সাধুকে দোল খাওয়ান। আবার ঐভাবে মুখ নীচু করেই তিনি লুচি ও পায়েস ভক্ষণ করেন। পূর্ণব্রহ্মের জ্ঞান হবার আগে পর্যন্ত বোধহয় লুচির তৃষ্ণা মানুষের যায় না।

মণীন্দ্রলালের 'রমলা'র নাম সে-যুগে কোন বাঙালি না শুনেছে। তাতে শুধু ওমর খৈয়াম, পিয়ানো বাজনা, শ্যাম্পেন আর হেলিওট্রোপ রঙের শাড়ি ছিল না, লুচির কথাও ছিল।

রজত চলেছে হাজারীবাগের রাঙামাটির রাস্তা দিয়ে। পুসপুসে যাচ্ছে পাহাড়ের মালা দেখতে দেখতে, নেপালী সুরে বাঁশী বাজাতে বাজাতে, ট্রেনে দেখা সেই মেয়েটির মুখ ভাবতে ভাবতে, মন্থর গতি হলেও পৌঁছে গেল সেই আশ্চর্য বাড়িতে। সেখানে সে এখন কাজীসাহেবের ফার্সী বয়েৎ শুনবে, কার্পেটের নক্শা দেখবে, কাটলেট খাবে। এসবের মধ্যে হঠাৎ রজত বলে উঠল—বাড়ি থেকে খাবার এনেছিলুম—'বাসি লুচি'। রমলা বললেন—'বাসি লুচি। ও লাভলি—মাই ফেভ্‌রিট।' ব্যস, জমে উঠল সোনারুপোর সুতো-জড়ানো অত্যাশ্চর্য বাঁধুনির অপরূপ বাক্‌প্রতিমার প্রেমকাহিনী।

বিভূতিভূষণের হাজারী ঠাকুরের ভাজা লুচির সুগন্ধ 'আদর্শ হিন্দু হোটেল' ছাপিয়ে বাংলা সাহিত্য জুড়ে ছড়িয়ে আছে। চালের বাতায় গুঁজে রাখা তার লুচিভাজা খুন্তিটির জন্য আমাদের মন কেমন করে। নলিনীকান্ত সরকার বলেছেন, মুর্শিদাবাদের নিমতিতা গ্রামের লুচি হতো পদ্মপাতার মতো বড় বড়। বাসি লুচি খাবার তাগ্‌বাগ্‌ সবাই জানে না। যজ্ঞিবাড়ির পরদিন বাড়ির ছাদে হোগলার নীচে মেয়েদের মজলিশ বসত। পাড়া-পড়শী সই-স্যাঙাত উমনো-ঝুমনো একত্তর হয়ে। দিস্তে দিস্তে বাসি লুচি ঘন পান্তুয়ার রসে—যে রস টলে না, কলাপাতার ওপরে দাঁড়িয়ে থাকে—ভাঙা পান্তুয়ার সঙ্গে লুচি ভেঙে, হাঁড়ি-মালসা কোলের কাছে নিয়ে কথাবার্তা চলত নানা ঢঙের।

কলকাতার ফুলকো লুচির সর্বদা ছোট সাইজ—যেন চাঁদটি, শুধু গায়ে খরগোস ছাপছোপ নেই। দেবস্থানের লুচি সর্বদা মোটা। মহন্তের গদিতে যত নগদ টাকা পড়বে, গুনে-গুনে তত লুচি পাবে। সমাজবিজ্ঞানী বিনয় ঘোষেরা তিনপুরুষ ধরে তাঁদের গ্রামের কুলদেবতা রাধাগোবিন্দের বিরাট ভোগের লুচি খেয়েছেন। এক-একটার ব্যাস আঠারো ইঞ্চি। যা ভাজবার কড়া হবে প্রকাণ্ড। বেলা এবং ভাজার কৌশলও আয়ত্তে চাই। ভোগ বিতরণের পরে জমিদারবাবুরা সম্রাটের নামে জয়ধ্বনি দিতেন বলে পণ্ডিত ভদ্দরলোক কটুকাটব্য করেছেন কেন? জমিদারেরা অসদাচারী বা শৌখীন রাজভক্ত যাই হোক না কেন রাজা-জমিদারদের বাদ দিয়ে সে-যুগে সভ্যতার রথ চালানো কঠিন ছিল।

আরও দু' তিনটি লুচির প্রসঙ্গ মনে পড়ছে—

> সৈদাবাদি খাসা ময়দা—মুর্শিদাবাদি ঘি
> একটুখানি সবুর করো লুচি ভেজে দি। ('একে তিন তিনে এক': অবন ঠাকুর)।

গুজরাতে দই দিয়ে মাখা খাস্তা লুচির নাম 'দইথারু'। এক সুন্দর নাতি কালো মেয়ে বিয়ে করতে চায় দেখে তার ঠাকুমা বললেন, ওমা সে কি, কাগে 'দইথারু' নিয়ে যাবে!

প্রভাত মুখুয্যের লুচি-স্তোত্র একটু শোনাই:

> হরে মুরারে মধু কৈটভারে গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে।
> খাস্তালুচি সৌরভ মুগ্ধচিত্তং
> বুভুক্ষিতং মাং জগদীশ রক্ষ॥

কোচবিহার রাজ্যের দেওয়ানপুত্র চারুচন্দ্র দত্ত বিলেতে হস্টেলে থাকতে বন্ধুদের সঙ্গে লুচি ভাজার চেষ্টা করেছিলেন। প্রথম দিকে হল ডগ্‌-বিস্কিট, তারপর একদিন গোল উজ্জ্বল হয়ে খাবার টেবিল আলো করে বিরাজ করল। বছরে একদিন তিনি দিশীরকমে ভোজ দিতেন: ট্রেনের মধ্যে লাটসাহেব ফ্রেজারকে চটি পায়ে, ধুতি পরে লুচি খাওয়ালেন ষোড়শ উপচারে।

সেকালের ছড়া ছিল একটা:

> ওগো লুচিনন্দিনী ঘৃতেভর্জিনী প্রেয়সী মহিষী প্রিয়ে।
> এসো চক্রাকারে বদন মাঝারে জুড়াই তাপিত হিয়ে॥

লুচির প্রসঙ্গে অধ্যাপক বিনোদবিহারীর স্মৃতিকথার থেকে একটি অদ্ভুত শব্দ শিখেছি—সেটি 'ডগ্‌-পাকী'।

বিনোদ বীরভূম মল্লারপুরে খেতে গেছেন একজনের বাড়ি। তাঁরা প্রথমে পাতে দুখানা মাত্র লুচি দিয়ে ভাত দিলেন। খাওয়া শেষ হবার মুখে বলা হল,—উঠবেন না, ডগ্‌পাকী হবে। বিনোদ ভাবলেন পাখির মাংস দেবে। বাড়িতে ফিরে মার কাছে শব্দটির ব্যাখ্যা শুনলেন। যারা পাকা ফলার খাওয়াতে পারে না, তারা আরম্ভ আর শেষ দুই মুখে লুচি দিয়ে ডগ্‌ পাকা করে দেয়।